প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

এস, ওয়াজেদ আলী

বি, এ, (ক্যান্টাব) বার-এট্-ল,

প্রণীত

দি বুক হাউস

১৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—১[illegible]

প্রকাশক—

ডি. বসু

৩৩নং মাণিকতলা মেন রোড,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—বিনয়ভূষণ ঘোষ

ললিত প্রেস

৫, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লার হাতে আমার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দিলাম।

বাবা

১৩ই অগ্রহায়ণ
১৩৫০ সাল

সূচীপত্র

সাকী ও কবি

আমাদের যুগ হচ্ছে নীতি-বাগীশদের যুগ। কাব্যে নীতি, সাহিত্যে নীতি, সর্ব্বত্রই নীতির চর্চ্চা। কবিদের লেখা পড়লে মনে হয়, নীতি প্রচার করবার জন্যই তাঁরা লেখনী ধারণ করেছেন। যাঁরা নীতির বিষয় প্রত্যক্ষ-ভাবে কিছু লেখেন না, তাঁরাও সামাজিক নীতিকে, আচারগত বিধি-নিষেধকে সম্ভ্রম করে চলেন। ফলে সাহিত্য আজ প্রাণহীন, আর কাব্য মরণাপন্ন।

চিরদিন কিন্তু এমন ছিল না। কবি একদিন স্বভাবের আহ্বানকে নীতির অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর লেখনী থেকে মুক্তা ঝরেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাকবি হাফেজের বিষয় দু'চার কথা আজ বলব। হাফেজ শরাব ভালবাসতেন, সাকীকে তিনি ভালবাসতেন, তাঁর তরুণী প্রিয়াকে ভালবাসতেন; আর এদের নিয়ে বাগানে, নদীর তীরে, উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে আনন্দ উপভোগ করাকে তিনি জীবনের একটা দুর্ল্লভ জিনিস বলে গণ্য করতেন। আর একথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করতে তিনি কোন রকম দ্বিধা অনুভব করতেন না। আর যাঁরা তাঁকে উপদেশ দিতে আসতেন, তাঁর কাজের সমালোচনা করতে আসতেন, তাঁরা তাঁর মুখ থেকে স্মরণীয় কিছু শুনে যেতেন। একটি গজলে কবি বলেছেন:

"বাগানে এখন স্বর্গের মলয় বাতাস বইছে!

এখানে আমি আছি, আমার প্রিয়া আছে, পরীর মত যার চেহারা, আর আছে আনন্দদায়িনী শরাব!

চারিদিকে বসন্তের আবাহন! ভবিষ্যৎ স্বর্গের আশায় এই হাতে-পাওয়া ধন ছেড়ে দেওয়া, সে কি বুদ্ধিমানের কাজ? শরাব দিয়ে আনন্দের সৌধ তুমি গড়ে তোল! এই নির্ম্মম পৃথিবী কিসের পিছনে আছে জান?

আমাদের মাটি দিয়ে সে ইট তৈয়ের করবার মতলব আঁটছে!

এ শত্রুর কাছ থেকে করুণার আশা করো না। যতই তুমি মন্দিরের আলো মসজিদে নিয়ে গিয়ে জ্বালাও না কেন!

আমি মাতাল? আমার নামে পাপের অঙ্ক উঠবে? আরে বন্ধু, তুমি কি জান কার কপালে ভাগ্য কি লিখে রেখেছে!

ফকির বটে, কিন্তু নিজেকে বাদশা বলতে আজ আমার কোন কুণ্ঠা নেই! মাথার উপর আমার মেঘের চন্দ্রাতপ! ক্ষেতের প্রান্তে আজ আমার উৎসবের মজলিস!

হাফেজ যখন মরবে, তার দেহকে কবরস্থ করতে যেতে কোন আপত্তি তুলো না বন্ধু! পাপে ডুবে আছে বটে, কিন্তু শেষে সে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছুবে!"

শরাবের গোলাপী নেশায়, এবং প্রিয়ার আবেশভরা চুম্বনের মধ্যেই হাফেজ অনন্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন, চিরন্তন সত্যের দর্শনলাভ করেছিলেন। একটী গজলে তিনি বলেছেন:

"আমার সাকী হলেন স্বয়ং খিজর, যিনি অনন্ত জীবনদায়িনী সুধা বিতরণ করেন! আমি শরাব কি করে বর্জ্জন করতে পারি?

প্রেমিকার মধুর ওষ্ঠাধরের মিষ্টতার কাছে মিছরিও হার মানে!

প্রিয়ার দেহের মধুর সুরভি, সে যে ঈসার ফুৎকারের মতই জীবন দান করবার শক্তি রাখে!

শত বৎসরের বৃদ্ধও সে ফুৎকারে নূতন জীবন লাভ করে!

শোন বন্ধু, তত্ত্বকথা তোমাকে কিছু বলি শোন! এই যে অগ্নিগর্ভ পানি অর্থাৎ শরাব, এর একটুখানি পেটে না গেলে, বিশ্ব সমস্যার সমাধান আমার মস্তিষ্ক তো করতে পারে না!

হে হাফেজ! পৃথিবীর এই জীবনে একমাত্র মূল্যবান্ জিনিস যে কি, তা কি তুমি জান? হিংসাদ্বেষহীন নির্ম্মল অন্তর—বাকি সব আবর্জ্জনা!"

প্রেম, প্রেমাস্পদ, সুরা, বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-কলরব, এসবকে হাফেজ অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন, আর তিনি একান্তমনে বিশ্বাস করতেন, খোদা চান আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে এসব জিনিস উপভোগ করি। নীতি-বাগীশদের ভৎ'সনা শুনে তিনি তাই হাস্য পরিহাস করতেন। একটী গজলে তিনি বলেছেন।

"হে নীতির ধ্বজাধারী ধার্ম্মিক, আমোদপ্রিয় স্বাধীনচেতা মানুষদের নিন্দাবাদ করো না। পরের পাপের বোঝা তোমাকে তো আর বইতে হবে না!

আমি ভালই হই, আর মন্দই হই, তোমার তাতে কি আসে যায়?

তুমি নিজের কাজে যাও! প্রত্যেকে সেই ফসলই পাবে, যার বীজ সে বুনেছে!

মাতাল আর জ্ঞানী, সকলেই নিজ নিজ প্রেমাস্পদের তল্লাসেই আছে! মসজিদ আর মন্দির সবই হচ্ছে প্রেমের নিকেতন!

আমি যে শরাবখানার দোয়ারের মাটিতে আমার মাথা লুটিয়ে দিচ্ছি—সে তাঁরই প্রেমের বশে!

যে সব লোক তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, তারা যদি আমায় বুঝতে না পারে, তাদের বল, তারা ইটের উপর গিয়ে মাথা ঠুকুক্!

বিচারের দিনের ভয় আমায় দেখায়ো না। পর্দ্দার অন্তরালে কে ধার্ম্মিক বলে গণ্য হবে, আর কে অধার্ম্মিক বলে গণ্য হবে, তুমি তার কি জান?

কেবল আমি তো নীতির পথ ছাড়িনি! আমার পিতা আদমও স্বর্গ ছেড়ে ছিলেন!

নিজের ক্রিয়া-কর্ম্মের উপর বেশী ভরসা করো না, বন্ধু! মহাশিল্পীর কলম তোমার নামের পাতায় কি লিখেছে, তা কি তোমার জানা আছে?

অন্তর তোমার যদি সত্যই এত অসহিষ্ণু আর অনুদার হয়, তা হলে তার পবিত্রতা গর্ব্ব করবার জিনিসই বটে! আর তোমার মন যদি এই রকম ছিদ্রান্বেষী হয়, তাহলে সেটা আবিলতাহীন মনই বটে!

স্বর্গের বাগান সুন্দর হতে পারে, তবে এই যে গাছের ছায়া আর নদীর তীর আজ আমাদের ভাগ্যে জুটেছে, তাদের তাচ্ছিল্য করো না!

হে হাফেজ! মৃত্যুর সময় যদি এক পেয়ালা প্রেমের শরাব পান করতে পার, শরাবখানার গলি থেকে সোজা তা হলে ফেরেস্তারা তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে!"

হাফেজ জীবনকে নিজের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি মত উপভোগ করতেন, আর এরূপ করাকে তিনি ধর্ম্ম বলে গণ্য করতেন। স্বর্গের লোভ দেখিয়ে আর নরকের ভয় দেখিয়ে যারা মানুষকে নীতির পথে আনতে চেষ্টা করতেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর শাণিত বাক্যবাণের প্রধান লক্ষ্য-বস্তু। এ সত্ত্বেও কিন্তু হাফেজের অন্তর ছিল বিশ্ব-প্রভুর প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ, আর পরমার্থের চিন্তাই ছিল তার জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য। একটী গজলে তিনি বলেছেন:

"তোমার আস্তানা ছাড়া
দাঁড়াবার যায়গা আমার নাই।
তোমার দরজা ছাড়া
মাথা রাখবার স্থান আমার নাই!

শত্রু যখন তরওয়াল খোলে, আমি তখন ঢাল দূরে ফেলে দিই; ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া অন্য অস্ত্র আমার নাই!

শরাবখানার গলি থেকে কেন আমি মুখ ফেরাতে যাব? শরাব পান আর আমোদ-প্রমোদের চেয়ে ভাল রীতি যে আমি খুঁজে পাই না!

কালের নির্ম্মম হাত আমার জীবনের গোলায় যদি আগুন লাগিয়ে দেয়, আমার তাতে দুঃখ নাই! জীবনকে আমি তৃণের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ বলে মনে করি না!

আমি সেই তন্বী তরুণীর অপাঙ্গ দৃষ্টির দাস, আত্মগরিমায় যে এতই মত্ত, যে কারও দিকে সে চেয়েও দেখে না!

কারও উপর অত্যাচার করো না, আর যা খুসি তাই করো! আমাদের ধর্ম্মে অন্যায় আর অত্যাচার ছাড়া পাপ নাই!"

পাঠকরা হয়তো ভাববেন হাফেজের মত মহাজ্ঞানী সাধক শরাব, সাকী আর মাশুককে নিয়ে কেন এত মত্ত হলেন? ওমার খৈয়ামের বিষয় এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। বিষটা বুঝতে হলে, তখনকার যুগের সামাজিক ইতিহাস একটু জানা দরকার। এই মহাপুরুষদের যুগে জীবন্ত ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করেছিল কতকগুলি আচার, অনুষ্ঠান এবং বিধি-নিষেধের সমষ্টি। আর ভণ্ড ধর্ম্মযাজকেরা এই সব তথাকথিত ধর্ম্মীয় অনুশাসনকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের উপর, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ম্মম শাসন এবং শোষণ-কার্য্য চালিয়ে যেতো। হাসা উচিৎ কিনা তা নিয়ে শাস্ত্রের বিধান দরকার, খেলা উচিৎ কিনা তা নিয়ে শাস্ত্রের বিধান দরকার, ভালবাসা উচিৎ কিনা তা নিয়ে শাস্ত্রের বিধান দরকার; এক কথায় জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি জিনিসের জন্য শাস্ত্রের বিধান দরকার, শাস্ত্রের সমর্থন দরকার, আর তার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে যাওয়া দরকার মোল্লা-মৌলুভিদের কাছে। এই কঠিন শাসনের ফলে স্বভাবধর্ম্ম লোপ পেতে বসেছিল, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা লোপ পেতে বসেছিল,, মানুষের স্বাধীনভাবে ভাববার, স্বাধীনভাবে কাজ

করবার ক্ষমতা লোপ পেতে বসেছিল। মানুষ স্বার্থসর্ব্বস্ব ভণ্ডধর্ম্মগুরুদের দাসে পরিণত হয়েছিল। এই দুর্দ্দিনে মহাকবিদের আবির্ভাব। তাঁদের লেখায় যে বিদ্রোহের স্বর বেজে উঠ্‌ল সে মধুর স্বর মৃতকল্প মানুষকে নূতন জীবন দান করলে। মানুষ স্বাধীন চিন্তার, স্বাভাবিক জীবনের আস্বাদ পেলে। মরণোন্মুখ সমাজে তাঁদের প্রতিভার প্রভাবে সভ্যতা অভিনব মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করলে। আর তাঁদের যাদুকরী লেখনীতে যে বিশ্বপ্রেম, স্বাভাবিক জীবনের প্রতি যে ঐকান্তিক অনুরাগ, ন্যায় এবং যুক্তির যে মহিমা ফুটে উঠ্‌ল, তা পারসিক সাহিত্যকে বিশ্বে এক গৌরবের আসন দান করলে। হাফেজ এবং খৈয়াম কাব্যের সাহায্যে সমাজ-জীবনে যে পরিবর্ত্তন এনেছিলেন, বড় বড় সংস্কারকেরা বিরাট সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় বিপ্লবের সাহায্যেও তা কচিৎ আনতে সক্ষম হয়েছেন! হাফেজ এবং খৈয়াম প্রভৃতি কবিদের কেবল কবি-হিসাবে দেখলে চলবে না; তাঁদের যুগ-প্রবর্ত্তক সংস্কারক হিসাবে, মানবের শ্রেষ্ঠ বন্ধু-হিসাবে, সভ্যতার পথপ্রদর্শক-হিসাবেও দেখতে হবে!

নদী

হৃদয় তোমার আজ আনন্দে স্ফীত। দুকূলে পুলক বিতরণ করে তুমি চলেছ—প্রিয় সম্মিলনের জন্য। বিরহের দীর্ঘ শীত শেষ হয়েছে। মিলনের দখিণে হাওয়া এবার বইতে সুরু করেছে। অশান্তি, উদ্বেগ তোমার প্রাণে আর নাই ; সেখানে আছে এখন কেবল প্রাণভরা ভালবাসা, হৃদয়-জোড়া বাসনা, আর প্রিয়-সম্মিলনের তরঙ্গায়িত আবেগ।

তোমায় দেখলে এখন প্রাণে উদ্বেগ আর থাকে না ; বাসনাই কেবল জাগে। অশান্তি আর থাকে না, আনন্দের গভীর উন্মাদনাতে প্রাণ মত্ত হয়ে উঠে। তোমার আকাশ-বাতাস এখন প্রেমের পূর্ণ পরিণতির মাদকতায় ভরপুর। সাধনার জ্বালাময় দীর্ঘ পথ তুমি অতিক্রম করেছ, সিদ্ধির এখন তুমি আনন্দময় এক প্রতীক।

বল দেখি গঙ্গে! প্রিয় সম্মিলনে কি তোমায় প্রাণের আশা মিটবে? যার জন্য পাহাড়, পর্ব্বত, নগর, প্রান্তর অতিক্রম করে এই সুদূর দেশে এসেছ. তাকে দেখে কি তুমি শান্তি পাবে? যে মহা মিলনের জন্য আজন্ম তুমি সাধনা করেছ, তাতে কি তোমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবে? না আবার সেই বিপদ সঙ্কুল, আবেগ উদ্বেগ ভরা কর্ম্ম ক্ষেত্রে ফেরবার জন্য অন্তর তোমার কেঁদে উঠবে?

আমার তো মনে হয়, জীবনের সেই সাধন ভূমির জন্য আবার তোমার প্রাণ চঞ্চল হবে, মিলনের নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি তোমার সহ্য হবে না, বিরহের তিক্ত-মধুর যাতনার জন্য আবার তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠবে!

গঙ্গে! তাইতো তুমি মেঘের আকার ধরে পুনরায় ফিরে যাও তোমার সাধন-ক্ষেত্রে! অবসাদময় আনন্দের স্থানে সেখানে আছে অতৃপ্তির উত্তেজনা,

বৈচিত্র্যহীন স্থখের স্থানে সেখানে আছে বৈচিত্র্যময় দুঃখ, আর অলস সিদ্ধির স্থানে সেখানে আছে জাগ্রত সাধনা! উদ্যমহীন নিশ্চেষ্টতা ছেড়ে সেই উদ্দাম, কর্ম্মঠ জীবনের জন্য কেঁদে উঠে তোমার প্রাণ!

গঙ্গে!

তোমার প্রাণ ঠিক আমারই মত!

সমুদ্রের কথা

কাল পুরী এসে পৌছেছি। এসে থেকে বারিধির অনন্ত বিস্তৃত সলিল রাশির বিচিত্র লীলাখেলাই দেখছি। এই আমি ঘরে বসে লিখছি, আর আমার সামনে সমুদ্রের অশ্রান্ত তরঙ্গরাশি বিরামহীন রোলে তটে এসে পড়ছে, প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে, অল্পমাত্র বিচলিত না হয়ে, বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করে, নূতন উদ্যমে নিজেদের আবার তটের পরে নিক্ষেপ করছে। বেলা-ভূমির নিস্পন্দ জড়তার সঙ্গে সমুদ্রের চঞ্চল সলিল রাশির এই বিরামহীন সংগ্রাম সত্যই প্রকৃতির একটা দর্শনীয় শিল্প সম্পদ। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, গতির সঙ্গে জড়তার, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব প্রকৃতির অন্তরতম সত্য, তার অভিব্যক্তি যেমন এই সমুদ্র আর বেলাভূমির অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখতে পাই, তেমনটি কি প্রকৃতিতে, কি আর্টে আর

কোথাও দেখিনি। এ দৃশ্য প্রাণ দিয়া অনুভব করা যায়, লেখনী দিয়ে বর্ণনা করা যায় না।

কাল সন্ধ্যার সময় তটভূমির উপর আমি বেড়াতে গিয়েছিলুম। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। তরঙ্গের অবিশ্রান্ত, অসুরকল্প প্রয়াস দেখবার জন্য যথেষ্ট আলো ছিল, অথচ পূর্ণিমা রাত্রির আলোক প্লাবনের মত, সেই ক্ষীণ আলো, সেই প্রয়াসের প্রচণ্ডতাকে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মিথ্যা আবরণে ঢাকেনি। জীবন মরণ সংগ্রামের উপযোগী কাল আবরণেই প্রকৃতির এই দুই বিরাটকায় প্রতিদ্বন্দ্বী মহারণে লিপ্ত ছিল। সম্মোহিতের মত স্তম্ভীভূত হয়ে এই দৃশ্য আমি দেখতে লাগলুম। কি প্রচণ্ড এক উন্মাদনার আবেগ বারিধির অন্তরকে আলোড়িত, আন্দোলিত করছে। তার সুগভীর হুঙ্কার—কত আশার, কত আকাঙ্খার অভিব্যক্তি সে! সঙ্কল্পের কত বড় এক বিরাট প্রেরণা দুর্ণিবার শক্তিকে তার অনুপ্রাণিত করেছে।

আর এই জড় পৃথিবী। সে তার স্বভাবের অনুসরণ করে সমুদ্রের আহ্বান প্রত্যাগান করছে, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনের চঞ্চল অধীরতাকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করছে, গতির বিরুদ্ধে স্থানুত্বের ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্ণিবার প্রাণশক্তির কাছে কিন্তু জমাট বাঁধা জড়তাকে হার মানতে হচ্ছে। সমুদ্রের জল রাশি এসে একটু একটু করে জড় পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে, তার অঙ্কস্থিত সন্তানদের, তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্তহীন সমুদ্রের আহ্বান, অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান, বিচিত্রতার সম্ভাবনা পূর্ণ গতির আহ্বান তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। এই জড়পিণ্ড পৃথিবীকে ছেড়ে তারা জীবনের প্রতীক, সমুদ্রের সলিল রাশির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সন্তানদের হারিয়ে পৃথিবী একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়ছে বটে, তার স্বভাব ধর্ম্ম কিন্তু সে ছাড়ছে না। নিঃশঙ্ক, নির্ভীক তার প্রাণ! অচপল

অটলতা তার ধর্ম্ম! অফুরন্ত ধৈর্য্য তার অস্ত্র। এই সম্বল নিয়ে সে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, জীবন শক্তির সঙ্গে! রক্ষণশীল, আচার পন্থীরা যেমন করে যুদ্ধ করে যায়, নূতনত্বকামী সংস্কার পন্থীদের সঙ্গে।

পৃথিবীর মৃত্তিকারূপ সন্তানেরা জীবনের আহ্বানে তাদের জননীকে ছেড়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশছে বটে, তা কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। জড়তা তাদের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিলে আছে, গতির চঞ্চলতা নিয়ে কতক্ষণ তারা কারবার করতে পারে? সমুদ্রের জলে মিশে আবার তারা তাদের স্বভাব ধর্ম্মে ফিরে আসছে। সমুদ্রের অন্তরের মধ্যেই তারা স্থবিরত্বের আসন রচনা করছে—তাদের মাতৃকা পৃথিবীর প্রতীক স্বরূপ নিশ্চল, নিস্পন্দ দ্বীপ রাশির সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর উপকরণ দিয়া রচিত সেই দ্বীপ রাশি সমুদ্রের গতিশীলতাকে নূতন করে প্রতিহত করবার চেষ্টা করছে। গতি আর স্থিতির সংগ্রাম নূতন করে আবার সুরু হচ্ছে।

সমুদ্রের সজাগ শক্তি কিন্তু তা দেখে ভীত হচ্ছে না। পৃথিবীর সন্তানের এই নূতন বিদ্রোহ দেখে নূতন করে সে তাদের আক্রমণ করছে! এবার এক দিক থেকে নয়, এবার চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমণ! এবার তো কেবল জড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। এবার যে কৃতঘ্নতার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম। মহাকালের আরম্ভ থেকে জীবন শক্তির সঙ্গে মৃত্যুর, গতির সঙ্গে স্থিতির, নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের এই দ্বন্দ্ব নিত্য নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে আর নিত্য নূতন মহাকাব্যের রচনা করছে। এই দুই মহাশক্তির অবিরাম দ্বন্দ্বই হচ্ছে জীবনের নিগূঢ়তম সত্য; আর এই সত্যটি পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে যেমন করে উপলব্ধি করছি, তেমন আর কোথাও করেছি বলে মনে হয় না।

মাছধরা

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি মোটরে করে পথ অতিক্রম করছিলুম। পথের দু ধারে দোকান পাট এবং মানুষের বাড়ী। হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হল, এক ফার্ম্মেসির দিকে। ভিতরে টেবিলের পাশে বসে দু চার জন লোক গল্প গুজব করছিল। খুব সম্ভব, তারা নিজেদের সুখ-দুঃখ, লাভ লোকসানের কথাই আলোচনা করছিল। উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব তাদের ছিল না। অমন গল্পরত অনেক লোক তো সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

আমার প্রাণে ভাবের এবং চিন্তার উৎস খুলে দিলে কিন্তু ছোট্ট একটী ছেলে। দরজার সামনে আসন পিড়ি হয়ে সে বসেছিল একটী চেয়ারে। হাতে তার লম্বাএকগাছি সরু কাঠ তার ডগায় বাঁধা একটুখানি সুতো! সুতোর ডগায় একটা খোলাম কুচি কিম্বা আর কিছু বাঁধা ছিল। ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। একান্ত গম্ভীর মুখে একমনে সে বসেছিল, সেই নিজের তৈয়ের করা ছিপটী হাতে করে! রাস্তার পাশ দিয়ে বৃষ্টির জলের স্রোত বয়ে চলেছিল ; সেই স্রোতে ছিপ ফেলে সে মাছের আশায় বসেছিল।

দোকানের ভেতর লোকেরা গল্প-গুজব করছিল। পথ দিয়ে পথিক, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, লরি প্রভৃতি কত কি যাওয়া আসা করছিল। আকাশ থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। এ সবের কোনটীর দিকেই তার লক্ষ্য ছিল না। এক মনে সে বসেছিল, মস্ত একটী আশা অন্তরে পোষণ করে— ছিপেতে মাছ ধরা দেবে, আর সেই মাছ সে ডাঙ্গায় তুলবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেলেটীকে অতিক্রম করে মোটর তার গন্তব্য পথে অগ্রসর হল। ছেলেটীর সেই ছিপ হাতে করা একান্ত কর্ম্মরত মূর্ত্তি, কিন্তু চিরতরে আমার মানসপটে আঁকা রইল।

রাস্তার ধারে ক্ষণিকের পড়া এক পশলা বৃষ্টির তৈয়েরী জলের স্রোত—কোথায় তাতে মাছ, আর, কোথায় তাতে কি ? কাঠের এক গাছি মনভুলান ছিপ, ডোরের কাজ তাতে দিচ্ছে এক টুকরো সাদা সুতো। টোপের অভাব পূরণ করছে এক টুকরো খোলামকুচি ! এই সব অসম্ভব যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বিরাট এক আশা অন্তরে পোষণ করে, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মত সে বসে আছে—মাছ ধরা দেবে আর সে মাছ সে ডাঙ্গায় তুলবে।

ছেলেটীর সেই নীরব সাধনার ফল যে কী হয়েছিল তার খবর নেবার কোন চেষ্টা আমি করিনি—করবার দরকারও নেই। মাছ যে তার ছিপে ধরা দেয়নি সেটা সুনিশ্চিত। তবে কি তার সেই ক্ষুদ্র সাধনাটুকু একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল ?

তা যদি হত, তা হলে আমার কলমের মুখে তার এই ছবি আজ ফুটে উঠতো না।

মাছ সে ধরেনি বটে ; কিন্তু তার ক্ষুদ্র অথচ ঐকান্তিক সাধনা একটা সাড়া এই বিশ্বে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সাড়ার স্পন্দনে একটা সাফল্যের ফুল কোথাও না কোথাও ফুটবেই ফুটবে।

ছেলেটীর মাছ ধরবার সেই একান্ত গভীর প্রচেষ্টার কথা ভাবতে ভাবতে আমার নিজের জীবনের বিবিধ প্রয়াসের কথা, আদর্শলোকে বিভিন্ন অভিযানের কথা মনে হল। কোনটীই এখন পর্য্যন্ত সফল হয়নি। বোধ হয় কখনো হবে ও না। কিন্তু তাই বলে কি সে সব নিরর্থক ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয় ?

যে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এবং যে unpromising জলস্রোতে ছেলেটী মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল, আমি যে তার চেয়ে অকেজো সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আদর্শের সাধনা করছি, কিম্বা তার সেই বৃষ্টি-রচিত রাস্তার জল-স্রোতের চেয়েও unpromising বেষ্টনীতে আদর্শের মাছ ধরবার চেষ্টা করছি, তাত মনে হয়

না। মাছ না ধরলেও ছেলেটী যখন একজন অনাহুত দর্শকের মনে এত বড় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তখন আমার পক্ষেও এ আশা করা অন্যায় হবে না যে, লক্ষীভূত আদর্শকে উপলব্ধ করতে যদি নাও পারি, তবু আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস কারও না কারও মনে নিশ্চয় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে, আর তা থেকে, অচিন্তনীয় একটা মঙ্গল পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ঘটবেই ঘটবে। সাধনা আমার, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে নিশ্চয় সার্থক হবে।

পট ভূমিকা

সব জিনিসেরই একটা পটভূমি আছে। আর তার শোভা, তার সৌন্দর্য্য, তার মূল্য অনেকাংশে সেই ভূমিকার উপর নির্ভর করে। গোলাপ ফুল কত সুন্দর, অথচ তার সৌন্দর্য্যকে সত্যই মনোরম করে তোলে তার সবুজ পাতার বেষ্টনী। পল্লবহীন গোলাপ ফুল কতকটা শ্রীহীন বলেই আমাদের মনে হয়। রক্তকমল কি সুন্দর ফুল! কিন্তু তার প্রকৃত শোভা যদি পাঠক দেখতে চান, তার সৌন্দর্য্য যদি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে চান, তাহলে তাকে দেখতে হয় তার স্বাভাবিক পটভূমিকায়, দীঘির জলে যেখানে সবুজ পাতার বেষ্টনীর মধ্যে সগর্ব্বে সে দাঁড়িয়ে আছে, তন্বী কিশোরীর মত মৃনালের মাথায় মুকুট হয়ে? আকাশের তারকা কি সুন্দর জিনিষ। অথচ তার সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে হলে, তার স্বাভাবিক পটভূমি—

অন্তহীন মেঘশূন্য আকাশ চাই, অন্ধকার রাত্রি চাই, বিস্তীর্ণ প্রান্তর চাই। এই উপযোগী পটভূমি না থাকলে আকাশের তারকাও শ্রীহীন হয়ে যায়।

আমাদের জীবনের সব জিনিসের, তথা সব কাজেরই একটা স্বাভাবিক ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা না থাকলে, সে জিনিষ বা সে কায যেন কেমন অসঙ্গত, কেমন অশোভন, কেমন বেমানান ঠেকে! আপনার ছোট ছেলেটী যদি আব্দার করে এসে বলে, বাবা আজ ঘুড়ি আর লাটাই কিনে দিতে হবে, তা নাহলে আমি স্কুলে যাবনা, তার কচি মুখে সে কথা কত সুন্দর শুনায়। কিন্তু বাড়ীর চাকর এসে যদি দাড়ি নেড়ে বলে, আজ আমাকে পাঁচ টাকা দিতেই হবে, তা নাহলে আমি চাকুরী ছেড়ে দেব, তাহলে তার এই অসঙ্গত আব্দার কত রূঢ় বলে মনে হয়! যা ছেলের মুখে শোভা পায়, তা চাকরের মুখে শোভা পায়না, যা শিশুর মুখে শোভা পায় তা বয়ঃপ্রাপ্তের মুখে শোভা পায়না। একই কথা, একই আব্দার এক জনের মুখে অতি সুন্দর শুনায়, আর একজনের মুখে একান্ত অশোভন, একান্ত অপ্রিয় রূপেই প্রতিভাত হয়। এত বড় প্রভেদ পটভূমির তারতম্যের দরুণই হয়ে থাকে। শিশুর আব্দারের পটভূমি হচ্ছে তার শৈশবসুলভ সারল্য, তার অসহায়তা, তার নির্ভরশীলতা, আপনার প্রতি তার অন্তরের ভালবাসা, আর তার প্রতি আপনার অন্তরের টান! এই সব মিলে যে ঐন্দ্রজালিক পটভূমির সৃষ্টি করেছে তার অনুকূল বেষ্টনীই শিশুর আব্দারকে এত প্রিয়, এত শোভন, এত স্বাভাবিক, এত সুন্দর করে তুলেছে। আপনার চাকরের দাবী বাহ্যতঃ একই ধরনের হলেও, তার পটভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। চাকর কিছু শিশু নয়। লাভ লোকসান সে বেশ বোঝে। শিশুর সরলতা তার নাই। শিশুর মত সে অসহায় নয়। আপনার কাছে গতর খাটিয়ে সে পয়সা অর্জ্জন করছে, অন্যের কাছেও সে তাই করেছে, কিংবা দরকার হলে করতে পারে। উপজীবিকার জন্য আপাততঃ আপনার কাছে সে কতকটা নির্ভর করে বটে, কিন্তু সে বেশ জানে, আর আপনিও জানেন যে,

আপনার চাকরী ছেড়ে প্রয়োজন হলে সে অন্যের কাছেও চাকরী করতে পারে। তার পর, শিশুর দাবী হল প্রেমের দাবী, আর চাকরের দাবী হল আইনের দাবী। শিশু দাবী করে, কেননা, আপনি তাকে দিতে ইচ্ছে করেন। আপনি তাকে আনন্দ দিতে চান, আর সে সেই আনন্দ দেবার সুযোগ আপনাকে দিতে চায়। শিশুকে আনন্দ দিয়ে আপনি তার চেয়ে কম আনন্দ পান না। পক্ষান্তরে চাকরের দাবীর সে মধুর পটভূমিকা নাই। সে চায় তার দাবী আছে বলে। আপনি না দিলে, আদালতে গিয়ে দাবী করবার অধিকার তার আছে বলে। আপনি না দিলে, কায ছেড়ে সে সহজে আপনাকে বিপদে ফেল্‌তে পারে বলে। এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমির দরুণ তার আব্দার একান্ত রূঢ়, একান্ত ভয়াবহ হয়ে উঠে!

যাঁরা প্রকৃত শিল্পী তা, জীবনের শিল্পীই হোন আর কলা-শিল্পীই হোন, তাঁরা এই back ground এর কথা, মনে রেখেই শিল্প সাধনা করেন। যাঁরা পট ভূমিকার কথা ভুলে যান, তাঁরা প্রকৃত শিল্পী নন, তাঁদের শিল্প-সাধনা ব্যর্থ হয়।

প্রসাধনের ব্যাপারে নারী হচ্ছেন প্রকৃত শিল্পী। পটভূমিকার দিকে, বিভিন্ন রংয়ের সামঞ্জস্যের দিকে, বিভিন্ন উপকরণের দিকে কত তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি কোন পারিপার্শিকতায় কি ভাবে বেশ বিন্যাস করলে তাঁর শ্রী, তাঁর সৌন্দর্য্য সম্যকভাবে ফুটে উঠবে, সে দিকে তার কত আগ্রহ, কত যত্ন, কত কর্ম্ম-তৎপরতা! ঘাতকের তীক্ষ্ণধার কুঠার যখন মস্তকচ্ছেদন করবার জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষা করছে, সেই অবস্থাতেও প্রকৃত প্রসাধন শিল্পী Mary, Queen of Scots তাঁর প্রসাধনের কথা মোটেই ভোলেননি। ঐতিহাসিক Froude লিখছেন :—

On his (Provost Marshal's) returning with the Sheriff, however, a few minutes later the door was open, and they were confronted with the tall majestic figure of Mary Stuart

standing before them in splendour. The plain grey dress had been exchanged for a robe of black satin ; her jacket was of black satin also looped and slashed and trimmed with velvet. Her false hair was arranged studiously with a coif and over her head and falling down over her back was a white veil of delicate lawn. A crucifix of gold hung from her neck. In her hand she held a crucifix of ivory and a number of jewelled paternosters was attached to her gridle.

কে বলবে যে মেরী ঘাতকের কুঠারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এযে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন। এই প্রসাধনের বলেই মেরী মানুষের অন্তরে চিরকালের তরে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন। স্কটল্যাণ্ডবাসীরা এখনও তাঁকে ভুলতে পারেনি।

পাঠক বলবেন, মেরীর প্রসাধনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার সম্পর্ক কি ? বলির মাঠ, ঘাতকের কুঠার, কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ ; এ পারিপার্শ্বিকতার জন্য নিড়াম্বর পোষাকইতো সব চেয়ে শোভন, এবং উপযোগী !

মেরী ভুল করেন নি, তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী। সর্ব্বপ্রকার প্রসাধনের, সর্ব্বপ্রকার শিল্প সাধনার গভীর একটা উদ্দেশ্য থাকে। আর সেই উদ্দেশ্যই সেই প্রসাধনকে, সেই শিল্প সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ ক্ষেত্রে মেরীও তাঁর উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রসাধন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের মনে, দেশবাসীর মনে গভীর সহানুভূতির সঞ্চার করা ; তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে সে বিষয় জন-সাধরণকে অবহিত করা ; রাজ-সিংহাসনই যে তাঁর যোগ্যস্থান এ ধারণা মানুষের মনে সৃষ্টী করা ; আর তাঁর প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, তার প্রতিশোধের ইচ্ছা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে মেরী ঠিক প্রসাধনই

করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মেরীর প্রসাধন, তাঁর শিল্প-সাধনা, ব্যর্থ হয়নি।

স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই হলেন সবের সেরা শিল্পী—শিল্পীদের রাণী। সাধারণ শিল্পীর কৃতিত্ব নির্ভর করে, তিনি প্রকৃতির নিকট থেকে কতটা শিক্ষা লাভ করেছেন, তার উপর। দার্শনিক Plato শিল্পীকে প্রকৃতির অনুবর্ত্তক নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এ যুগের শিল্পসমালোচকেরা সে মত গ্রহণ করেন না। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব কিছু না দিলে তাঁর কার্য্যকে চারুশিল্পের পর্য্যায়ে ফেলা হয় না। তবে এ কথাও সত্য যে আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি তার আভাস, তার প্রেরণা প্রকৃতি থেকেই পেয়ে থাকি। সেদিক থেকে দেখলে Plato-র মতবাদকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। একবার আমাদের সাহিত্য আর শিল্পের কথা ভাবুন। আমরা যে স্বর্গের বিচিত্র হর্ম্মাবলীর কল্পনা করি, তা'কি আকাশে মেঘের বিচিত্র খেলা দেখে নয়? আমরা যে আদর্শ সুন্দরীর রং-এর কল্পনা করি তা'কি ফুলের বিচিত্র রং দেখে নয়? গায়কের যে আদর্শ স্বরলহরীর কল্পনা করি তা'কি পাখির গান শুনে নয়? আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের দৈনন্দিন বাক্যালাপ তাওতো প্রকৃতি থেকে আহৃত উপমায় ভরা। গোলাপের মত রং, মুক্তার মত দাঁত, পটলচেরা চোখ, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, গজমন্থর গতি, সিংহের বিক্রম, এ সব কি প্রমাণ করে না যে আমরা ভাবের জন্য আদর্শের জন্য, প্রেরণার জন্য প্রকৃতি দেবীরই দ্বারস্থ হই! তাই বলি প্রকৃতি দেবীই হলেন আর্টের রাণী, আর্টের মন্ত্রের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ন্তর নাই!

পাকা ওস্তাদের মত, সিদ্ধহস্ত শিল্পীর মত পারিপার্শ্বিকের দিকে একান্ত তীক্ষ্ণ, একান্ত সজাগ দৃষ্টি রেখেই প্রকৃতি দেবী শিল্প সাধনা করেন। মানুষ যত বড় শিল্পীই হোক এ বিষয়ে প্রকৃতিকে সে হার মানাতে পারবে না। একবার

লক্ষ্য করুণ! প্রত্যেক পশু, প্রত্যেক পক্ষী, প্রত্যেক কীট, প্রত্যেক পতঙ্গ, এক কথায় প্রত্যেকটী প্রাণীকে তার বেষ্টনী বা পট ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখে রং দেওয়া হয়েছে, আকার প্রকার দেওয়া হয়েছে, ভাব ভাষা সব কিছু দেওয়া হয়েছে। শীত প্রধান দেশের প্রাণীর চেহারা, আকার প্রকার হাব ভাব সেই দেশের উপযোগী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাণীর বিষয়ও সেই একই কথা বলা চলে। মরুবাসী প্রাণীর বিশিষ্ট রং, বিশিষ্ট আকার-প্রকার, বিশিষ্ট ধরণ-ধারণ আছে। জঙ্গলের প্রাণীর আবার বিশিষ্ট রং, বিশিষ্ট আকার-প্রকার, বিশিষ্ট ধরণ-ধারণ আছে। প্রকৃতি তার শিল্প-সাধনায় ভূমিকার কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভোলেন না। কৃতী শিল্পী এ বিষয় প্রকৃতিরই ছাত্র।

কেবল কৃতী শিল্পী কেন? আমাদের প্রত্যেককেই প্রকৃতি এবিষয় শিক্ষা দেন, সমাজ আমাদের শিক্ষার ভার হাতে নেবার বহু পূর্ব্বে, আমাদের শৈশব জীবনে! আমার পাচ বৎসরের ছেলের মুখে একবার অমূল্য একটী কথা শুনেছিলুম। একদিন সে আব্দার করে বসল "বাবা, আজ ভূতের গল্প বলতে হবে। তবে এখন নয়। সন্ধ্যে হলে পর। আর ইলেকট্রিক বাতি হলে চলবে না। আঁধার ঘরে মোম বাতি জ্বালিয়ে ভূতের গল্প বলতে হবে।" আমি বললুম "আঁধার ঘরে কেন? মোম বাতি কেন? ওসব না হলেও তো চলতে পারে?" সে বল্লে "ভূতের গল্প, আঁধার ঘরে, মোম বাতির অস্পষ্ট আলোকেই ভাল শুনায়।" আমার মনে হয় প্লেটোও এর চেয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে পারতেন না। Setting, Back ground, ভূমিকা, বেষ্টনী প্রভৃতির মূল্য শিশু যেমন স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছে, তার চেয়ে পরিষ্কার করে বলা যায় না। ভূতের গল্পের জন্য চাই আঁধার রাত, মোম বাতির অস্পষ্ট আলোক! এসব না থাকলে ভূতের গল্পের আসল বিশেষত্বটা, তার ভয়, আতঙ্ক, বিভীষিকা সৃষ্টির ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। যে বিশেষত্বের জন্য ভূতের গল্প শুনতে চাই তার সে বিশেষত্বই চলে যাবে।

পট-ভূমির দিকে, বেষ্টনীর দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প-সাধনা করতে প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা দেন বটে, কিন্তু কাজটা প্রথমে যত সহজ মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তত সহজ নয়। দক্ষ আর্টিষ্ট ছাড়া প্রকৃতির অনুসরণ সুচারু ভাবে কেউ করতে পারে না। সরল স্বাভাবিক ভাষার লেখা যেমন কঠিন, সরল স্বাভাবিক ভাবে ছবি আকাও তেমন কঠিন। সরল স্বাভাবিক সৃষ্টি কার্য্যের পেছনে আছে অক্লান্ত সাধনা; কেবল Techniqueএর সাধনা নয়, কেবল আর্টের সাধনা, নয়; জীবন সাধনা, সত্য সাধনা। অনেক অস্বাভাবিক লেখার পর তবে সরল স্বাভাবিক লেখা বের হয়; অনেক অস্বাভাবিক ছবির পর তবে সরল স্বাভাবিক ছবি বের হয়; সেই সরল স্বাভাবিক সৃষ্টি আয়ত্ত করবার জন্য, আর্টকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্তাধীন করতে হয়। তাছাড়া নিজের দৃষ্টিকে, নিজের জীবনকে সরল স্বাভাবিক করে তুলতে হয়। কেননা প্রকৃত আর্ট মানুষের চরিত্রের, তার ব্যক্তিত্বের, তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ এবং প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। একটি সরল স্বাভাবিক সুর বার করবার জন্যে এক খণ্ড বাঁশকে কত রকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। একটা সরল স্বাভাবিক গান গায়বার জন্যে একজন গায়ককে কত সাধনা করতে হয়। সরল স্বাভাবিক ভাবে চলবার জন্যে শিশুকে কতবার পড়তে হয়, কতবার উঠতে হয়।

সাধনার নির্দ্দেশ প্রকৃতি দেন, আর সাধনার পথও প্রকৃতিই দেখিয়ে দেন। কত রকম জীব জন্তুর সৃষ্টি করে, তাদের ভেতর থেকে শেষে প্রকৃতি মানুষকে বের করেছেন! কত যুগ যুগান্তের চেষ্টার পর, সাধনার পর প্রকৃতি মানুষের পায়ে চলবার শক্তি দিয়েছেন, মানুষের হাতে যন্ত্র ব্যবহার করবার শক্তি দিয়েছেন, মানুষের চোখে দেখবার শক্তি দিয়েছেন, মানুষের কাণে শুনবার শক্তি দিয়েছেন, মানুষের নাকে ঘ্রাণ গ্রহণ করবার শক্তি দিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কে ভাববার, চিন্তা করবার শক্তি দিয়েছেন! বিরাট এই শিল্প-সাধনায় দুইটী জিনিষের দিকে প্রকৃতি লক্ষ্য রেখেছেন, আদর্শ (Ideal) এবং বেষ্টনী

(Environment); আমাদের শিল্প-সাধনায়, আমাদের জীবন সাধনায় এই দুইটী জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদেরও দরকার। তা যদি না করি তাহ'লে আমাদের সাধনা ব্যর্থ হবে, পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হবে। জীবন আর শিল্পের মধ্যে প্রভেদ করাই ভুল। কেননা জীবন শিল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর সাধারণতঃ যাকে আমরা শিল্প বলি সে জিনিস জীবনের একটা অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে জীবন-শিল্পই হল সব শিল্পের রাজা! আর যিনি জীবনের প্রকৃত শিল্পী, তিনিই হলেন শিল্পীদের রাজা।

যুগে যুগে এক এক জন মহাপুরুষ এসে পৃথিবীকে বদলে দেন। অভিনব এক বিশ্বের সৃষ্টি করেন। মানুষের মনে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্খা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন উন্মাদনা জাগিয়ে তোলেন। তাঁরাই হলেন প্রকৃত জীবন-শিল্পী। পারিপার্শ্বিকতার দিকে, পটভূমির দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা জীবন সাধনা করেন। আর তাই তাঁদের সাধনা বিস্ময়কর ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়। মোহাম্মদ, জীসাস, মুসা, বুদ্ধ, আকবর প্রভৃতি ছিলেন এই ধরণের শিল্পী। এঁরাই হলেন শিল্পীদের রাজা!

জীবনের পটভূমি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। চিত্রকর নিজের পটভূমি নিজেই রচনা করেন, আর সেই পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চিত্র রচনা করেন। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি কথা শিল্পীরাও তাই করেন। জীবনের শিল্পীকে কিন্তু প্রকৃতি রচিত পটভূমি নিয়েই শিল্প সাধনা করতে হয়। এই প্রাকৃতিক পটভূমি পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং শিল্পীকেও প্রয়োজন মত তাঁর সাধনার ধারাকে নিত্য নূতন পথে চালাতে হয়। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পটভূমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেয়। তাঁর শিল্প সাধনা তাই সফল হয়।

ওস্তাদদের শিষ্যরা কিন্তু অনুকরণের দিকেই যান, পারিপার্শ্বিকতার বৈশিষ্ট্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ভিন্ন পারিপর্শ্বিককার মধ্যে, ভিন্ন পটভূমিতে তাঁরা সেই জিনিষ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন, যা ওস্তাদ অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার

মধ্যে, উপযোগী পটভূমিতে সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে তাঁদের সাধনা ব্যর্থ হয়। আর দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতার দরুণ, ব্যর্থতার সঠিক কারণ বুঝতে না পেরে, নিজেদের অক্ষমতাকে দায়ী না করে, তাঁরা দায়ী করেন পৃথিবীর লোককে, কলিকালের ধর্ম্মহীনতাকে, অদৃষ্টকে, আরও কত কিছুকে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, তাঁরা শিল্পী নন, পটভূমির বৈশিষ্ট্য বোঝবার ক্ষমতা তাঁদের নাই, আর তাই সাফল্যের আশা তাঁদের পক্ষে দুরাশা মাত্র।

আগে বলেছি, চিত্রকর নিজের পটভূমি নিজেই রচনা করেন। তবে এ বিষয় তিনি যথেচ্ছাচার করতে পারেননা। চিত্রের মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে পটভূমি রচনা করতে হয়। সিংহের ছবি আঁকতে হলে, মরু প্রান্তর কিংবা দুর্গম পর্ব্বত কিংবা গভীর জঙ্গলকে পটভূমি করা দরকার। পিকনিকের ছবি আঁকতে হলে তার উপযোগী রম্য পটভূমির দরকার। প্রত্যেক বিষয়-বস্তুর জন্যই তার বিশিষ্ট্য পটভূমির দরকার।

কি আঁকব তা ভেবে পটভূমি তৈয়ের করতে হয়। আবার অনেক সময় পটভূমি দেখে কি আঁকব তা ঠিক করতে হয়। তবে সাধারণতঃ পটভূমি আর বিষয়বস্তু এক সঙ্গেই মনের মধ্যে এসে দেখা দেয়। নিম্ন শ্রেণীর শিল্পীর পটভূমি এবং চিত্রের বিষয়বস্তু উভয়ই অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জিনিস, আর বড় শিল্পীর পটভূমি এবং বিষয়বস্তু উভয়ই অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর জিনিস। জীবন শিল্পের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় না। একজন জীবন-শিল্পীর সাধনার বিষয়-বস্তু হচ্ছে তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ, অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তার সাধনার পটভূমি হচ্ছে তার ক্ষুদ্র গ্রাম কিম্বা সহর। আর একজন জীবন-শিল্পীর বিষয়বস্তু হয়তো তার দেশের গৌরব। তার পটভূমি হচ্ছে তার দেশ এবং তার পারিপার্শ্বিক রাজ্যের বেড়। আবার কোন শিল্পীর সাধনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানবের মঙ্গল। তার পটভূমি হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী। কোন জীবন শিল্পী আবার ভূমার সঙ্গে আত্মার ঐক্য সাধনকেই নিজের

শিল্পের বিষয়বস্তু করেন। তাঁর শিল্পের পটভূমি হচ্ছে অন্তহীন কাল, আর সীমাহীন বিশ্ব।

মানুষের মন এমনই ভাবে গঠিত যে সীমার বন্ধনে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে মন ক্রমাগত অসীমের দিকে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে। সীমাবদ্ধ নশ্বর জীবন নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। অবিনশ্বর অনন্ত জীবনেরই কামনা করি, সীমাবদ্ধ ধরনীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি না, অসীম আকাশের দিকে চাই। সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সীমাবদ্ধ শক্তি, সীমাবদ্ধ প্রেম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি না। সীমাহীন পরম জ্ঞানের, সীমাহীন ঐশী শক্তির, সীমাহীন ভগবৎ প্রেমের কামনা করি। নদীর সীমাবদ্ধ জলের প্রবাহ যেমন বারিধির অন্তহীন সলিলরাশির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ধাবিত হয়, আমাদের সীমাবদ্ধ মনও তেমনি ভূমার অন্তহীন চেতনার সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। জীবনের প্রকৃত শিল্পী তাই শেষে অন্তহীন বিশ্বকে, সীমার অতীত ভূমাকে তাঁর সাধনার পটভূমি না করে থাকতে পারেন না।

শিল্পের সাধনা, হচ্ছে সুরের সাধনা, ঐক্যের সাধনা। পটভূমির সঙ্গে বিষয়-বস্তুর ঐক্য, এই হল চিত্র শিল্পের সাধনা। প্রয়াসের সঙ্গে বেষ্টনীর ঐক্য, এই হল জীবন-শিল্পের সাধনা। ভূমার সঙ্গে আত্মার ঐক্য, এই হল তাপসের সাধনা। এই শেষোক্ত সাধনা যতক্ষণ না পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ মানুষের আত্মা শান্তি লাভ করে না। ততক্ষণ সে যেন কিসের অভাব অনুভব করতে থাকে। কে যেন সুদূর থেকে তাকে ডাকতে থাকে। চীন দেশীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে, Yuclchi গ্রন্থে ঋষিকল্প লেখক অতি মূল্যবান কথা বলেছেন।

"All ceremonies, music and Laws have a single aim, which is to train the character and to make good Government possible.. ...Between the ballads and the music of the

people and the character of their Government there is an intimate connection......the five notes of the scalc symbolise the monarch, the ministers of the state, the people, public administration, and the materials to be used in Government. If there be no disorder no irregularity in the musical scalses, there will be no lack of harmony in the state,

......The common people know what tunes are, but it takes a Chuntzu (a gentleman, a man of taste and refine ment) to know what music is......He who understands both ceremonies and music is the civilized man...When ceremonies, music, and Laws are interacting harmoniously, there is nothing to prevent the realization of the kingly Government ......Music comes from within, ceremonies from without...... If music be allowed to have full results, the mind will cease to be dissatisfied and restless ; if ceremonies are allowed to have their full results, men will be at peace with one another ......There will be no oppressive Government, feudal princes will cease to rebel and will be received as honoured guests at court : there will be no occasion for war, no need for harsh punishments ; the people will have no complaints, the son of Heaven (i. e, the Emperor) will have no cause for wrath, Let these Conditons be realised and there will be universal music throughout the land......music reproduces the harmonious interaction between heaven and earth,

ceremonies reproduce the results of that harmony......It is an old saying—where joy is, there is music.........

......Virtue is natural in man and grows as a tree grows, music is its blossoming......ceremoneis and music partake of of the nature of both heaven and earth. Their influence reaches to heaven and to spiritual beings : they bring the divine down to earth and raise humanity to heaven."

Vide Confucianism and Modern China

by R. F. Johnston.

কবির প্রেরণা

কবি বসে বসে ভাবছে একটা কিছু লিখতে হবে, সুন্দর কবিত্বময় কিছু, যা পড়ে লোকে বলবে হাঁ কবি বটে, প্রেরণা আছে। নিকটের বাঁশবনে একটা কোকিল কুহু কুহু রবে ডাকছিল, অবিশ্রান্ত, আবেগভরা তার সে ডাক। কবি ভাবলে,—এই কোকিলের ব্যথার কথাই লিখি। লেখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে। তা থেকে বেরুলো কিন্তু সেই মামুলি গৎ, হাজার কবি যা হাজার হাজার রকমে লিখেছে। নতুন কিছু বেরুল না। অসন্তুষ্ট কবি লেখা ছিঁড়ে ফেল্‌লে।

তারপর কবি ভাবলে,—বসন্তের এই আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতের বিষয় কিছু লিখি। পাখীরা তাদের আনন্দকাকলিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রছিল।

মলয় সমীর প্রাণে অব্যক্ত কত বাসনার সৃষ্টি করছিল। গাছের নতুন পাতা, নতুন ফুল প্রীতি-সম্ভাষণে পরস্পরের দিকে চাচ্ছিল। কবি পদ-রচনা করতে সুরু করলে।

না, এও সেই মামুলি গৎ! কবিতার জন্ম থেকে কবিরা এই একই কথা লিখে এসেছে! অবজ্ঞায়, অভিমানে কবি তার অসমাপ্ত লেখা দূরে নিক্ষেপ করলে। মনে মনে বল্‌লে,—না, আমার দ্বারা লেখাটেখা কিছু হবে না। যাই বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি। প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। লেখার কথা ভেবে অনর্থক মাথা গরম করে লাভ নাই।

কবি বাইরে বেরুল। মাঠের পাশ দিয়া পথ। পথের দু ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা; কি সুন্দর সেই ঘাস! কি চোখ-জুড়ানো তাদের রং। পরিচিত ছেলে-মেয়েরা এক জায়গায় রেলের লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেণের যাওয়া-আসা দেখছিল। কবি তাদের দিকে চেয়ে হাসতেই তারা লজ্জা-কুণ্ঠা-প্রীতিভরা সর্ব্বজয়ী একটা হাসি হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে গেল। কি সুন্দর এই শিশুরা, কি মধুর এদের হাসি! কবি চলতে লাগল। কতকগুলো তেলাকুচোর ফল একটা পানের বোরোজের গা থেকে ঝুল্‌ছিল। নধরকান্তি শিশুদের ওষ্ঠাধরের মতই তারা টুকটুক করছিল। বোরোজের জীর্ণ ধূসর গায়ে তাদের উজ্জ্বল হাসি-ভরা সেই মুখগুলি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল —বৃদ্ধ ঠাকুরদার কোলে যেন নধরকান্তি নাতি-নাতিনীর দল! কবি আবার ভাবলে,—কি সুন্দর এই জগৎ! কি প্রাণ-বিমোহন এর জীবন-প্রবাহ।

বেড়াতে বেড়াতে কবি এল তাদের বাগানের পুরাণো ঘাটের কাছে। কত কি কারণে এক যুগ ধরে কবি এই ঘাটের কাছে আসে নি। যৌবনের উন্মেষের সময় কবি রোজই এই ঘাটে আসত তার বন্ধুদের সঙ্গে, আর এখানে বসে কত কথাই না কইত, কত খেলাই না খেলত! আশা, আনন্দ, প্রীতিভরা কি মধুর ছিল সে জীবন।

অনেক দিন পরে অতীতের স্মৃতি-ভরা এই ঘাটটী দেখে কবির প্রাণ পুলক এবং ব্যথা-ভরা অপূর্ব্ব এক ভাবাবেশে কেঁপে উঠল। অতীতের সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি তাদের প্রীতিভরা হাসি নিয়ে আবার তার চোখের সামনে জেগে উঠল। ক্ষণেকের তরে আত্মবিস্মৃত হয়ে সময়ের সুদূর ব্যবধান অতিক্রম করে কবি সেই অতীতের জগতে চলে গেল! হঠাৎ, নারকল গাছের শুকনো একটা শাখা ধপ করে মাটিতে এসে পড়ল। কবির মোহ ভেঙ্গে গেল।

কোথা গেল রামধনুর বিচিত্র বর্ণে শোভিত জীবনের প্রভাতের সেই দিনগুলি! অতীতের অতল-স্পর্শ গহ্বরে তারা ডুবে গেছে! কোথা গেল সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি, একান্ত অন্তরঙ্গ সেই বন্ধুগুলি! কেউ জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছে, কেউ সুদূর প্রবাসে চলে গেছে, কেউ একেবারে বদলে গেছে, অতীতের সঙ্গে তার যেন কোন সম্বন্ধ নেই! অতর্কিতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু কবির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর এল—অনুশোচনা!

কবি ভাবলে—সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অবিস্মরণীয় সেই অতীত জীবনকে বাচিয়ে রাখবার জন্য কি আমি করেছি? ক'জন বন্ধুব খবর নিয়েছি, ক'জনের সঙ্গে দেখা করেছি?

হঠাৎ লেখার কথা তার মনে এল। কবি বললে—নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমার বাণী যদি অক্ষম না হয়, সেই সুন্দর জীবনের স্মৃতি লুপ্ত হবে না। এই পুরাণো ঘাটই হবে আমার কবিতার বিষয়। আর অতীতের সেই মধুমাখা জীবনই হবে তার অমৃত-সরোবর!

কিছুকাল পূর্ব্বের ভাবের ব্যর্থ সন্ধানের কথা কবির মনে পড়ল। কবি ভাবলে—লেখার জন্য ভাবের সন্ধান করলুম, ভাব এল না। নিজেকে জীবনের সুখ-দুঃখের প্রবাহের মধ্যে ছেড়ে দিলুম—ভাব তার মধ্যে থেকে আপনিই উথলে উঠল! কবিতা লেখবার জন্য কলম ধরে বসলে, কবিতা আসে না। জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে, কবিতা কলম থেকে

আপনিই ঝরে পড়ে! লেখার জন্য ভাবের চর্চা কিছু নয়, ভাবের অভিব্যক্তির জন্যই হচ্চে লেখার চর্চা! যারা লেখার জন্য ভাবের চর্চা করে, তারা হল dilettante নকল কবি; আর যারা ভাবের অভিব্যঞ্জনার জন্য লেখে, তারাই হল আসল কবি—বাণীর সন্তান।

চাঁদামামার ভরসা

ছেলেবেলায় আমার এক ছোট বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছিলুম। আকাশ, তারকাখচিত নীল আকাশের ঐ বিরাট চাঁদোয়া নাকি বহু কাল আগে, কতকাল আগে অবশ্য সঠিক সে বলতে পারেনি, আমাদের এই পৃথিবীর অতি নিকটে ছিল। সে একদিন ছিল। ছেলেরা তখন মনের সুখে তারকাদের সঙ্গে খেলা করতো। যে বুড়ী চাঁদে বসে সুতো কাটে, তার কাছে গিয়ে গল্প শুনতো। সুর্যি মামাকে তার বিষয় জিজ্ঞাসা-বাদ করতো। তখন তাদের দিন সুখে কাটতো।

একদিন বদ-মেজাজী এক বুড়ী ঝাঁটা দিয়ে তার ঘরের আঙিনা পরিষ্কার করছিল। ঘরে ভাত নেই। ছেলেপিলেরা সব অকালে মারা গিয়েছে। স্বামীও অনেকদিন হল গত হয়েছেন। বুড়ীর মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। রাগে সে গর গর করছিল, আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে কত কি বকছিল। তার দুঃখের কথা শোনবার জন্যে কেউ তার কাছে এসে দাঁড়ায়নি বলে বুড়ীর

রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য লোকের দোষ দেওয়া যায় না। কে অমন বদ মেজাজী বুড়ির বকবকানি দাঁড়িয়ে শুনতে যাবে? ছেলেরা তো যাবেই না। বড়রাও যায়নি। সমস্ত দুনিয়ার উপর অভিমানে বুড়ির মন তাই সেদিন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ বুড়ীর দৃষ্টি পড়ল আকাশের দিকে। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। চাঁদা মামা এই সবেমাত্র আকাশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। মুখে তাঁর হাসি ধরে না। যেন ভারী একটা মজার কথা কারও কাছ থেকে শুনেছেন। দূরে দু-একটি তারকা সলজ্জ দৃষ্টিতে মিট্ মিট্ করে পৃথিবীর দিকে চাইছে। মনের আনন্দ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে। বুড়ীর মনে হলো. তার দিকে কেউ চাইছে না, তার বিষয় কেউ ভাবছে না, তার কথা কেউ শুনছে না।

বুড়ী শুনেছিল ঐ আকাশের উপর, আকাশের চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-তারাদের উপরই মানুষের অদৃষ্ট, তার ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ সবকিছু নির্ভর করে। বুড়ীর মেজাজটা তখন বিষম গরম হয়ে উঠেছিল। সে বললে, অভাগাদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখি আমার কপালে কেবল দুঃখের ভাগটাই কেন রেখেছে। ঐ তো ঐ জমিদারের গিন্নী। কি এমন সুকৃতি যে তার কপালে কেবল সুখই রাখা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাত্নী, আর বউ-ঝিয়ে যেন বাড়ীতে হাট বসে গেছে। পয়সা-কড়ির অভাব নেই। বাগান থেকে কত রকম ফল-পাকড় তরি-তরকারি নিত্যই আসছে। পুকুর—দীঘি থেকে আসছে বড় বড় মাছ, আর গোয়াল থেকে আসছে হাঁড়ি হাঁড়ি দুধ, হাটের ময়রারা ভারায় ভারায় কত রকম মিষ্টান্ন রোজ পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। আর—আমার বেলায়?

বুড়ী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাইলে। আরও অনেক কিছু তার বলবার ছিল। তবে, বুড়ি ভাবলো' একবার দেখাই যাক্ না ওঁরা কি বলেন। দেখি, চাঁদামামা আমার দুঃখের কথা শুনে চিন্তিত হয়েছেন কি না। তারকারা

আমার দুঃখে ব্যথিত হয়েছে কি না। আকাশ আমার দুঃখে চোখের জল ফেলছে কি না।

বুড়ী দেখলে তার দুঃখের কথায় কারও মন গলেনি। চাঁদামামা আগেরই মতন সলজ্জ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখছেন। আকাশে দুঃখের কোথাও কোন চিহ্ন নেই। সকলেরই সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্বিকার ভাব! বুড়ির রাগ একেবারে উপচে উঠল। তুবড়ির মধ্য থেকে যেমন আগুনের ফিনকি ছোটে, বুড়ির মুখ থেকে তেমনি অশ্রাব্য গালি, আর প্রচণ্ড অভিশাপ বের হতে লাগলো। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সকলকে সম্বোধন করে সজোরে ঝাঁটা নাড়তে নাড়তে বুড়ি বলতে লাগলো, "দূর হ অভাগা আর অভাগীর দল, আমার কাছ থেকে এখখুনি দূর হ। হাসিঠাট্টার জায়গা পাসনে? আমার দুঃখের কথা শুনে হাসি ঠাট্টা করতে এসেছিস। এখনই দূর হ বলছি, নইলে এই ঝাঁটা দিয়ে তোদের ঝাঁটাপেটা করবো। তোরা কি লজ্জা সরম খুইয়ে……

এতক্ষণে আকাশের চাঁদামামা আর তারকা-বধূদের দৃষ্টি বুড়ির উপর পড়ল। বুড়ির ঝাঁটা নাড়া তাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন, তার কথাগুলো কান দিয়ে শুনলেন। মেয়েমানুষের অমন বিকট অঙ্গভঙ্গি তাঁরা কখনও দেখেননি, আর অমন অশ্রাব্য ভাষাও কখনও শোনেননি। সমস্বরে এক-জোটে তাঁরা বলে উঠলেন, "এ পৃথিবী বড় বদ জায়গা। এখানকার বাসিন্দারা অতি অধম লোক। এ পৃথিবীর কাছে আর আমাদের থাকা হবে না। এখান থেকে দূরে চলে যাওয়া যাক।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশ, পৃথিবী থেকে দূরে, অতি দূরে চলে গেল। বুড়ি চীৎকার করতে লাগল। ঝাঁটা নাড়তে লাগলো। কিন্তু তার কথা কেউ শুনতে পেল না, আর তার ঝাঁটা নাড়াও কেউ দেখতে পেল না।

আমার ছোট বন্ধুটি মুখ গম্ভীর করে বললে, "পাজি বুড়িটার দোষেই আমরা চাঁদামামা, সূয্যিমামা—আর আকাশের আর আর সব বন্ধুদের হারিয়েছি। তা নইলে আজ কেমন মজার সঙ্গে তাদের সাথে খেলতুম, তাদের কাছে কতরকম কথা শুনতুম।" বন্ধুর কথায় সায় না দিয়ে থাকতে পারলুম না। অনেকদিন আমি গল্পটী শুনেছি, এখনও কিন্তু ভুলতে পারিনি। আমার মনে হয়, এই গল্পের মধ্যে মস্ত বড় একখা সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, আর তাই এটি অমন গভীরভাবে আমার মনের সঙ্গে গাঁথা রয়ে গেছে। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, এমন কি খোদা স্বয়ং আর তাঁর দেবদূত, পীর পয়গম্বর মুনি ঋষির দল, এরা সকলেই একদিন আমাদের অতি নিকটে ছিলেন। আমরা তখন মনের সুখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতুম, তাঁদের কাছে আবেদন নিবেদন জানাতুম, তাঁদের নিয়ে পরম সুখে থাকতুম। পৃথিবী তখন স্বর্গেরই একটা অংশ ছিল।

পৃথিবী থেকে তাঁরা দূরে চলে গেলেন আমাদেরই দোষে। আমাদের রাগ, আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের সংযমহীন ভাষা আর আমাদের অন্যায়, অসঙ্গত আব্দারই তাদের তাড়ালে। আমাদের এই সব নীচতা দেখে তাঁরা ভাবলেন, "না, এই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে থাকা হবে না, এরা ছোটলোক। আমাদের দূরে থাকাই ভাল।" তাই তাঁরা আমাদের ছেড়ে দূরে, অতি দূরে চলে গেছেন।

তবে দূরে গেলেও, তাঁরা একেবারে আমাদের ভোলেন নি। দূর থেকেও আমাদের তাঁরা দেখেন, আমাদের মঙ্গল চিন্তা করেন আর দূর থেকে আমাদের ভালর জন্য যা সম্ভব তাই করেন। আর আমরাও, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাদের মন শিশুর মত সরল, তাঁদের কথা আজও ভুলতে পারি নি। তাই আমরা এখনও তাদের দিকে চেয়ে থাকি, তাঁদের কথা ভাবি। আর, তাঁরা আমাদের কাছে আবার ফিরে এলে বড় ভাল হয়, এই আকাঙ্ক্ষা-টুকু অন্তরের নিভৃত কোনে পোষণ করি।

বুড়ির গল্প শোনবার পর চাঁদমামার সঙ্গে স্বপ্নে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তাঁকে বললুম, "চাঁদমামা, বুড়ি অন্যায় করেছে। তোমার কাছে কত কি গল্প শুনতুম। গ্রহতারকাদের সঙ্গে কেমন মজায় লুকোচুরি খেলতুম। অভাগী বুড়ি সব নষ্ট করে দিয়েছে!"

চাঁদামামা মুচকি হেসে বললেন, "আমরা দূরে যাইনি বাছা, কাছেই আছি। তবে আমরা অনেক বিদ্যে জানি কি না; বিদ্যের বলে তোমাদের মনে আমরা একটা ভ্রমের সৃষ্টি করেছি। তোমরা তাই মনে কর, আমরা অনেক দূরে চলে গিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, কিন্তু সেই আগের মত আমরা তোমাদের খুব কাছেই আছি।"

আমি বললুম, "ওসব কথা আমি বুঝি না চাঁদমামা, আচ্ছা বলুন দেখি, আপনারা সত্যি কখন আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবেন?"

চাঁদমামা বললেন, "যে দিন মানুষের মন, তোমাদের মতো অর্থাৎ শিশুর মতো সরল হবে, যে দিন তারা স্বার্থের কথা ভুলে, সুন্দরের চিন্তায় মসগুল হবে, যেদিন তারা খারাপ কথা বলা, অন্যায় আব্দার করা ছেড়ে দেবে; যে দিন তারা খোদা আর তাঁর ফেরেস্তাদের (দেবদূতদের) উপর হুকুম না চালিয়ে তাদের হুকুম মানতে শিখবে, যে দিন তারা পীর পয়গম্বরদের, মুনি ঋষিদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য না ডেকে, তাঁদের কাছ থেকে সত্যের, শ্রেয়ের আর সুন্দরের তত্ত্বকথা শুনতে চাইবে, সে দিন আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসবো।"

আমি বললুম, "বলুন চাঁদমামা, সে দিন কবে আসবে, বলুন!"

স্মিতহাস্যে চাঁদমামা বললেন, "সে বাছা তোমাদের উপরই নির্ভর করে। তোমরা চেষ্টা করলেই তো ও রকম হতে পার।"

আমি বললুম, "তাতো বটে, কিন্তু, মানুষ যে ওরকম হতে চায়না।"

চাঁদমামা বললেন, "তা, যে চায়না, সে চায় না। তুমি একাই ওরকম হও, তাহলে, তোমার কাছে আমরা ফিরে আসব।"

আমি বললুম, "ওরকম হওয়া কি শক্ত, চাঁদামামা ?" চাঁদামামা বললেন, "মোটেই নয়। নিজের কথা ভুলে খোদার কথা ভেবো, তাহলেই ওরকম হয়ে যাবে।"

আমি বললুম, "আচ্ছা চাঁদামামা, আমি চেষ্টা করব।" চাঁদামামা স্নেহ-মাখা কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ বাবা, চেষ্টা করো। আমরা সকলে মিলে তোমাকে সাহায্য করতে ভুলবো না।"

গাছে পাখীরা ডেকে উঠল, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জীবনে প্রকৃতির প্রভাব

সমুদ্রের ধারে বন্ধুর প্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে বসে আছি। আকাশ ধুসর জলদ রাশিতে আচ্ছন্ন। ঝুর ঝুর করে পড়ছে। অদূরে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বীচিমালা গভীর হুঙ্কারে সমুদ্র বক্ষ আলোড়িত করছে। প্রকৃতির এই গম্ভীর অর্থ পূর্ণ দৃশ্য দেখছি, আর জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলি মনের মধ্যে বারিধির উর্ম্মিমালারই মত চিন্তা এবং ভাবের মানসিক উর্ম্মিমালার সৃষ্টি করছে।

দেখতে দেখতে একটী কথা একান্ত স্পষ্ট হয়ে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। আমরা তো এই প্রকৃতিরই সন্তান। আমাদের শিল্প, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সভ্যতা তো এই প্রকৃতিরই দান। আমাদের জীবন তো প্রকৃতিরই অন্যতম শিল্প-প্রয়াস মাত্র।

দুদিন আগে কলকাতায় ছিলুম। জনতা-বহুল, কর্ম্ম-কোলাহল মুখরিত জন-পদ। সেখানে কেবল মনে হত কাজের কথা, নিজের ambition এর কথা। সেখানকার প্রকৃতি ছিল হীন এবং তুচ্ছ, আর আমার মনও তাই হীন এবং তুচ্ছ চিন্তার আবর্জ্জনায় ভরে থাকতো; পঙ্কিল পুকুর যেমন ভরে থাকে কর্দ্দম আর কীটাণুতে।

আজ এই বিরাট মহীয়সী প্রকৃতির সামনে সে সব হীন, তুচ্ছ চিন্তা একেবারে ভুলে গিয়েছি। চেষ্টা করেও তাদের মনের মধ্যে জাগাতে পারছি না। জীবনের অনিত্যতা, বিশ্বের বিরাটত্ব, প্রকৃতির অন্তরালের অঘটনঘটনীয় রহস্য এই সব বিষয় আপনা থেকেই মনকে আন্দোলিত, আলোড়িত করছে। কলকাতায় এসব চিন্তা আমার মনে স্থান পেতো না। সংসারের তুচ্ছ চিন্তাই সেখানে তাদের অপ্রতিহত অধিকার উপভোগ করতো।

মনে হল, আমরা যেন প্রকৃতির হাতের মাটীর পুতুল! প্রকৃতিই তার ইচ্ছানুযায়ী আমাদের ভাঙ্গে আর গড়ে। তারই শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত, আর তারই দীক্ষায় আমরা দীক্ষিত।

ধর্ম্ম-সাধকেরা যে জন-কোলাহল ছেড়ে পর্ব্বত-কন্দর আর মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তার কারণ, তাঁরা বেশ জানেন, সাধকের জন্য অনুকূল প্রকৃতি ঠিক সেই রকম অপরিহার্য্য, সন্তান-লাভের জন্য যেমন স্ত্রী-সংসর্গ। সন্তান-লাভের বাসনা মনের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-সংসর্গের উপলক্ষ ছাড়া সন্তান-লাভ ঘটে না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষাও সেই রকম আমাদের মনের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু অনুকূল প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিকতা না পেলে ইচ্ছা, ইচ্ছাই থেকে যায়, সার্থক হয় না।

কেবল ব্যাষ্টির জীবনে কেন, সমষ্টির জীবনেও প্রকৃতির গভীর এবং ব্যাপক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সুসামঞ্জস আর্ট, যুক্তিমূলক দর্শন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে গ্রীক সভ্যতার বিশিষ্ট দান। আর এ সবের মূলীভূত কারণ

হচ্ছে গ্রীসের সুন্দর, সুবিন্যস্ত অথচ অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, তার বাণিজ্য-কোলাহল-মুখরিত, বন্দর বহুল সমুদ্রপোকূল, আর তার পর্ব্বত প্রাকার বেষ্টিত, সুবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ। ভারতীয় সভ্যতার আকার-প্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের; কেননা ভারতের প্রকৃতিও ভিন্ন ধরণের।

সেমিটিক জাতীয় ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার মধ্যে যে একেশ্বরবাদের এবং অপরিবর্ত্তনীয় বিধিনিষেধের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়, তার মূলে আছে মরু প্রকৃতির বিশেষত্ব আর বিক্ষিপ্ত ভ্রাম্যমান যাযাবর জীবনের (Nomadic life) প্রয়োজন। উপরে অন্তহীন নীল আকাশ আর নীচে অন্তহীন বালুকারাশি। এই দুই অন্তহীনতার মধ্যে বিশ্বের একত্ব আর মানবের ক্ষুদ্রতা যেমন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আর কোথাও তেমন করা যায় না।

দুর্গম পথঘাট, বিপদ-সঙ্কুল অরক্ষিত জীবন, সম্পদহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব-সমষ্টি। চিন্তা করবার, experiment করবার অবসর সেখানে নাই। সে জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধের; আর প্রয়োজন, আদেশ মান্য করার জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের, এবং আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য উপযুক্ত শাস্তির। প্রকৃতির এবং জীবনের এই বিশেষত্বের ছাপ সেমিটিক সভ্যতার মধ্যে অতি স্পষ্ট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভারতের সভ্যতাতেও প্রকৃতির ছাপ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসনীতি কি সাহারার মরু প্রান্তরে, কিংবা অইসল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালায় প্রচার করা যেতো? গ্রীসের কোন সমাজ ব্যবস্থাপক কি সমুদ্র-যাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতে পারতেন?

মাটীর পুতুলের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে অবশ্য বড় একটা প্রভেদ আছে। মাটীর পুতুলের মনন শক্তি নেই, আমাদের আছে। এই প্রভেদের জন্যই মাটীর পুতুল হচ্ছে মাটীর পুতুল, আর মানুষ হচ্ছে মানুষ। প্রকৃতি আমাদের গড়ে আর ভাঙ্গে বটে, কিন্তু কোন্ প্রকৃতি আমাদের গড়বে, আর

কোন্ প্রকৃতি আমাদের ভাঙ্গবে তা নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আর তা ছাড়া আমরা যেমন প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতিও তেমনি আমাদের অধীন। প্রকৃতির বাইরে যেতে না পারলেও, সে যেমন আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে, আমরাও তেমনি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

প্রকৃতি যদি কলকাতায় আমার শরীরকে ভাঙ্গতে থাকে, কলকাতা ছেড়ে দার্জ্জিলিং কিংবা শিলংএ গিয়ে শরীরকে আমি শুধ্‌রে নিতে পারি। সৌন্দর্য্য-হীন প্রকৃতি যদি আমার মনকে নির্জীব এবং নিরানন্দ করে তোলে, সুন্দর প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা করে সেই মনকে আমি সজীব এবং আনন্দময় করে তুলতে পারি।

পাখী যখন যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকে, তার রং এবং আকার-প্রকার সেই পারিপার্শ্বিকতার অনুরূপ হয়ে যায়; আমরাও তেমনি, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকি, আমাদের রং এবং আকার-প্রকার সেই পারিপার্শ্বিকতারই, অনুরূপ হয়ে যায়। আদর্শকে জীবনে মূর্ত্ত করে তুলতে হলে, আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে তার অনুকূল করে তুলতে হবে, আর প্রয়োজন মত দূরে অবস্থিত অনুকূল প্রকৃতির মধ্যেও জীবন যাপন করতে হবে। জীবনকে যদি সার্থক করতে চাই, জীবনে যদি সত্য, শ্রেয়, সুন্দরকে মূর্ত্ত করে তুলতে চাই, আর, জীবনের ধারাকে যদি অন্তরের নিগূঢ়তম প্রেরণার সঙ্গে সুসামঞ্জস করতে চাই তাহলে প্রকৃতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। ভাবের জন্য প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, প্রেরণার জন্য প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, আর সান্ত্বনার জন্যও প্রকৃতির কাছে যেতে হবে। শরীরের জন্য প্রকৃতির নিকট থেকে আমরা আহার্য্য সংগ্রহ করি; মনের জন্যও তেমনি তার কাছ থেকে আহার্য্য সংগ্রহ করতে হবে। মন এবং শরীরের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হবে।

পিক্‌নিক

এমন লোক অতি অল্পই দেখেছি বন-ভোজের নামে যার প্রাণ নেচে না ওঠে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ত কথাই নেই, প্রবীণ বৃদ্ধরাও এমন কি অনেক দেশে বৃদ্ধারাও পিক্‌নিকের নাম শুনলেই চঞ্চলচিত্ত হয়ে পড়েন। নিজেকে এখন আর আমি ছেলে ছোকরাদের দলে গণ্য করতে পারি না। ছাত্রজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনের দুই তিন বৎসর যে সব উত্তেজনা মনকে চঞ্চল করে তুলতো, তাদের অধিকাংশই আমার জীবন থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেছে। যে দুই একটী অনাশ্রিত আগন্তুকের মত এখনও পড়ে আছে, শীঘ্রই তাদেরও বোধ হয় Fresh fields and pastures newএর তল্লাসে বেরুতে হবে। পিক্‌নিক নামক বিলাসটী এখন পর্য্যন্ত তার পুরান অধিকার ছাড়েনি, আর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় যে ছাড়বার খেয়াল আসতে তার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পিক্‌নিকের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব আমাদের সনাতন-প্রীতির এক সুন্দর নিদর্শন। এখন যাকে Picnic বা বন-ভোজ বলা হয়, আমাদের অরণ্য-বিহারী পূর্ব্বপুরুষদের সেই ছিল সাধারণ ভোজন পদ্ধতি। সে অনেক দিনের কথা। তারপর আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আমরা বড় বড় কোঠা বানিয়েছি, প্রশস্ত রাজপথ বিছ-ইয়ে সুন্দর সুন্দর সহর বসিয়েছি। এক কথায়—আমরা সভ্য হয়েছি। এখন প্রত্যেক নগরে এক একটা প্রকাণ্ড Police Court মাথা তুলে আমাদের ন্যায়-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আইনের জাল এখন ক্রমেই মানুষকে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে ঘিরে ফেলেছে। এখন আর কারও জমিতে পা দেবার যো নাই, তখনই

৪৭৮ ধারাতে কেস আসবে, কারও সম্পত্তিতে হাত দেবার যো নাই, তখনই ৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা রুজু হবে, কারও গায়ে হাত দেবার যো নাই, তখনই ৩২৩ কিংবা ৩২৪ কিংবা আরও কোন ভয়াবহ ধারা এসে আমাদের গলা টিপে ধরবে। প্রপিতামহদের বিপদসঙ্কুল অথচ মুক্তজীবন আর আমাদের নাই। সেই স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল জীবন-পদ্ধতি চিরকালের জন্য অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। এখন যারা Socialism, Bolshevism প্রভৃতির ধুঁয়া ধরে বেড়ায়, তারা আমাদের আরও কঠিন আইনের নিগড়ে বাঁধতে চায়। সেই মুক্ত এবং অকৃত্রিম আদিম জীবন ফিরে পাব বলে আর আশা করতে পারি না।

বাল্যজীবন যদিও ছেড়ে এসেছি, তার স্মৃতিটুকু কিন্তু আজও আমাদের অন্তরে জেগে আছে, আর সেই বিগত জীবনের অনুভূতিগুলি চিরকালের তরে আমাদের মস্তিষ্কে রেখাপাত করে গেছে। যৌবনে, কিংবা প্রৌঢ়ত্বে একা নির্জ্জনে পেলে এই সব বাল্য-স্মৃতি, কৃত্রিম এই সভ্যতার যুগেও মনকে আমাদের চঞ্চল করে তোলে। হ্যাট, কোট আর মোটা মোটা ইংরাজি আইনের বইগুলো তখন একেবারেই ভাল লাগে না। প্রপিতামহদের মত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার উৎকট একটা প্রবৃত্তি নূতন করে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। আর তাকে শান্ত করবার জন্য শিকার কিংবা পিক্‌নিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পিক্‌নিকের সাহায্যে দুধের স্বাদ অনেকটা ঘোলে মেটে।

অনেকে পিক্‌নিকের জন্য কোন পার্কে কিংবা কোন ধনী বন্ধুর বাগানে যেতে ভালবাসেন। আমার কিন্তু ভেজাল শূন্য জঙ্গল না হ'লে মন উঠে না। মানুষ থেকে, সমাজ থেকে এবং সভ্যতা থেকে যত দূরে যেতে পারি, পিক্‌নিক ততই উপভোগ্য হয়। সভ্য জগতের কোন লোককে পিক্‌নিকের স্থানে দেখলে রাগে মন গর গর করতে থাকে। দৈবদুর্ব্বিপাকে পিক্‌নিকের স্থানে অন্যান্য

পিক্‌নিক পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ কয়েকবার ঘটেছে। সে বেচারারাও বোধ হয় আমারই মত কোন নিগূঢ় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সেখানে এসেছিল। কিন্তু প্রীতি-আলাপ ত' দূরের কথা, চু'চক্ষে তাদের দেখতে পারিনি। তাদেরও মনে যদি আমারই মত ভাবের আবির্ভাব হয়ে থাকে., তা হ'লে বলতে হবে যে উভয়েরই যাত্রা ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য বনের পিক্‌নিকে বুনো লোকের সঙ্গে মিশতে এবং আলাপ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তারা Environmentএর সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে যায়। আমরা যে আদি পুরুষদের জীবনে ফিরে গেছি, সেই illusionটা আরও গাঢ় হয়। সেইজন্য পিক্‌নিকে আমি বুনো লোকদের প্রত্যাশায় থাকি, আর তাদের দেখলে আমার মনে বিশেষ একটা ভ্রাতৃভাব জেগে উঠে। তাদের সঙ্গে তাদেরই জীবনের খুঁটিনাটি কথা নিয়ে অনেক সময় কাটিয়ে দিই। সময়ের অপব্যবহার হচ্ছে বলে মোটেই মনে হয় না।

পিক্‌নিকের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে হ'লে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। তারা সভ্যতার কৃত্রিমতা শেখেনি। তাদের প্রাণখোলা হাসি আর প্রকৃতির প্রতি আদিম মানবোচিত প্রীতি পিক্‌নিকের ক্ষণস্থায়ী বন-জীবনকে যথাসম্ভব বাস্তব করে তোলে। তারা যখন বনের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানে ফেরে, কিংবা দৈত্য-দানবের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, তখন প্রপিতামহদের বিপদসঙ্কুল জীবনের একটা নিখুঁত ছবি আমরা দেখতে পাই। সেই অতীত জীবনের অনুভূতি এবং মনোভাব আমাদের পক্ষে অনেকটা বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।

পরিত্যক্ত সভ্যতার একটা জিনিষ সঙ্গে না থাকলে কিন্তু পিক্‌নিক উপভোগ করতে একেবারেই পারি না—সেটা হচ্ছে ধূমপানের উপকরণ। সহরে অনেক সময় সিগারেটেই কাজ চলে যায়, আর সাধারণতঃ আমি চুরুটের চেয়ে

সিগারেটই বেশী পছন্দ করি, কিন্তু পিক্‌নিকে চুরুটই হচ্ছে আসল জিনিষ— The thing. চুরুটের ধুঁয়া মনকে এক সুদূর কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়, সেখানে বাস্তব জগতের কথা ক্ষণিকের তরে একেবারে ভুলে যাই, আর চুরুটের বাষ্পীয় বিমানে চড়ে মন গড়া খেয়ালের বাদশাহীতে স্বচ্ছন্দ গতিতে, নিরাতঙ্ক প্রাণে অবাধে বিহার করে বেড়াই। এই কর্ম্মবহুল, নৈরাশ্য লাঞ্ছিত, গ্লানিপূর্ণ বাস্তব জীবন তখন প্রকৃতই অতীত রজনীর দুঃস্বপ্নের মত দূরে পড়ে থাকে আর আমি নিজের কল্পকরোজ্জ্বল খেয়ালের রাজ্যে দিগ্বিজয়ী Alexanderএর মত সদর্পে পদ সঞ্চালন করে বেড়াই।

পিক্‌নিকের সঙ্গীরাও কিন্তু মনের এই বিলাস বিহারে বাধা জন্মান। তাঁদেরও সঙ্গ তখন হাট-বাজারের কোলাহল বলেই মনে হয়। সঙ্গীরা যখন ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন আমি তখন আমার cigar caseটী পকেটে নিয়ে আর লাঠি গাছটী হাতে করে অলক্ষিতে সরে পড়ি, আর দুই তিন ঘণ্টার জন্য Robinson Crusoeর মত একা বন-জঙ্গল explore করে বেড়াই। তখন মাথার উপর বিস্তৃত নীলাম্বর আর চারিদিকের মাঠ এবং জঙ্গল কি মনোরম শোভাই না ধারণ করে। মনের মধ্যে কত বিচিত্র খেয়াল এসে মূর্ত্তি গ্রহণ করতে থাকে। নিজের কল্পকুশলতা দেখে নিজেই অবাক হই। আইনের ব্যবসা তখন একান্ত নীরস বলে মনে হয়। আর সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশের জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

বনে, মাঠে এবং নদী সৈকতে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে ক্ষুধার সঞ্চার হ'তে থাকে। সঙ্গীদের কথা আবার তখন মনে আসে আর তাঁরা যে সব চিত্ত-বিনোদক এবং রসনা-তৃপ্তিকর উপকরণের রাসায়নিক সংযোগে ব্যস্ত আছেন, মন ভাবরাজ্য ছেড়ে সেই বাস্তবতার দিকেই ধাবিত হয়।

পিক্‌নিকের ক্ষুধার মত ক্ষুধা ঘরে কখনও অনুভব করেছি বলে মনে হয় না। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুবাস যে কত মনোরম হতে পারে, পিক্‌নিকে না গেলে

তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। পিক্‌নিকের সেই খিচুড়ী এবং কোর্ম্মার জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষা কি উপভোগ্য মানসিক অবস্থা। আর সেই স্বভাবদত্ত বুভুক্ষার নিবৃত্তি কি তৃপ্তিকর!

সভ্যতার সঙ্গে জীবনকে উপভোগ করবার ক্ষমতা যে কতটা আমরা হারিয়ে বসেছি তখনই যথার্থ সেটা বুঝতে পারি। সভ্যতা তখন আর একটা অমূল্য সম্পদ বলে মনে হয় না। স্বাস্থ্য, প্রকৃতির উদার সঙ্গ, ছেলেদের বিমল আনন্দ হাসি, আর আত্মীয় স্বজনের প্রীতি-কলরবের স্নেহময় ঝঙ্কারই তখন জীবনের পরম কাম্য বলে মনে হয়।

ভোজ সমাপ্তির সঙ্গে ক্লান্তি এসে শরীর এবং মনকে আবেশাভিভূত করে ফেলে। তখন পরস্পরের অনুভূতির কথা, আগেকার পিক্‌নিকের অভিজ্ঞতার কথা, শিকারের কথা, আর আমাদের পিক্‌নিক জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা নিয়ে লঘু আলাপ বড় মিষ্ট মনে হয়। ভোজের পর চা পান এই মধুর অবসাদময় কালক্ষেপে বিশেষ সহায়তা করে। চায়ের মধ্যে সুরার উত্তেজনা নাই, কিন্তু ক্লান্তি নাশের ক্ষমতা তার অসাধারণ, আর অবসাদময় চিত্তে স্ফূর্ত্তি আনতে চা সত্যই অমৃত-তুল্য। সিগারেটের চিত্ত-বিনোদক সুগন্ধের সঙ্গে চা পান এবং খোস-গল্পের কথা অনেক দিন মনে থাকে, আর সেই ক্ষণিক বন্য জীবনের স্মৃতিকে মধুরতর করে তোলে।

সূর্য্য আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। তার প্রেমময় কোমল স্পর্শে পশ্চিম আকাশের মেঘগুলি আরক্তিম হয়ে ওঠে। আর তাকে হারিয়ে প্রকৃতি বিষাদের কাল আবরণ পরতে থাকে। আমাদের প্রাণেও তখন বাস্তব জগৎ তার ক্ষণিক স্তব্ধ কোলাহলকে আবার ধ্বনিত করে তোলে। তখন তৈজস, গালিচা প্রভৃতি বেঁধে আবার আমরা জনপদের পথ নিই। পথে কিন্তু পিক্‌নিকেরই তুচ্ছ মধুর ঘটনাগুলির আলোচনা হয়। আর রাত্রে যখন তন্দ্রা এসে চোখ দুটীকে বুজিয়ে দেয়, তখনও সেই পিক্‌নিকেরই ঘটনাগুলি,

আমাদের তন্দ্রাভিভূত চেতনার দ্বারে কুণ্ঠিত আগন্তুকের মত মৃদু করে আঘাত করতে থাকে।

এভারেষ্ট পর্ব্বতের কথা

নভোমণ্ডল ভেদ করে, মস্তক সগর্ব্বে পৃথিবী থেকে তিরিশ হাজার ফিট উঁচুতে তুলে, দৃষ্টি সুদূর নীহারিকায় নিবদ্ধ করে, হিমালয়ের সু-উচ্চ গিরিমালাকে অতি সহজে অতিক্রম করে এভারেষ্ট পর্ব্বত একাই দাঁড়িয়েছিলেন। শরীর তাঁর অলঙ্কার এবং আড়ম্বর বর্জ্জিত শুভ্র তুষারে আবৃত। অপরের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে একান্ত দূরে রাখবার জন্যই যেন তিনি শীতল বরফের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করেছিলেন।

বায়ুমণ্ডলের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহসা প্রচণ্ডবেগে প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কারে তাঁর শরীর এবং মস্তকের উপর দিয়ে বইতে সুরু করলে। বিরাট আকাশের মেঘের জঠর থেকে লাফিয়ে দৈত্য নিক্ষিপ্ত ডাইনামাইটের মতই বিদ্যুৎ কড়্ কড়্ শব্দে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

সত্যই যেন দৈত্যবাহিনী আজ এভারেষ্ট পর্ব্বতের মস্তককে নত করবার জন্যে—আর তাঁর গৌরবকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে, তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে

যুদ্ধে মেতে গিয়েছিল। আকাশ, বাতাস, চরাচর বিশ্ব প্রকৃতি, স্তব্ধ বিস্ময়ে এই অলৌকিক সংগ্রাম দেখছিল, আর রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল!

পরিশ্রান্ত দৈত্যবাহিনী বিফল-মনোরথ হয়ে শেষে কিন্তু নিরস্ত হল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হল। মেঘমুক্ত সূর্য্যের অমল আলোকে পৃথিবী জল্ জল্ করে উঠলো। এভারেষ্ট পর্ব্বতের অলঙ্কারবর্জ্জিত শুভ্র দেহের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য-মহিমা পুনরায় বিশ্ববাসীর বিস্ময়োৎপাদন করতে লাগলো। মস্তক তাঁর পূর্ব্বের মতই গর্ব্বোন্নত, পূর্ব্বের মতই সগৌরবে একাই তিনি বিরাজমান!

এভারেষ্টের পদতলে বিস্তৃত অন্তহীন প্রান্তর, তাতে অসংখ্য নীতিদীর্ঘ পাহাড়, পর্ব্বত। তাদের দেহ বৃক্ষ এবং লতাগুল্মে আবৃত। সেই সব গাছ-গাছড়া ঘেঁষাঘেঁষিভাবে এক সঙ্গে বাস করতো; আর তাতেই তারা আনন্দ পেত। সময় তারা কাটাতো পরস্পরের সঙ্গে গল্প-গুজব করে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পোকা-মাকড়দের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে, আর সোহাগের ঝগড়া করে। তাদের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, আর সেটা তারা সুখেই কাটাতো। ভবিষ্যতের চিন্তা তারা বড় একটা করতো না। বর্ত্তমানের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকতো। তারা ভাবতো, কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি সুখের এই জীবন, কি মধুর এই আমোদ-প্রমোদ।

চিরতুষারাবৃত, উন্নতশীর্ষ, অচল, অটল এভারেষ্ট পর্ব্বতের বিরাট দেহের দিকে সবিস্ময়ে সসম্মানে সভয়ে তারা এক একবার চাইতো, আর পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতো—কি নিঃসঙ্গ ওঁর জীবন, কি দারুণ নির্জ্জনতায় ওঁকে সময় কাটাতে হয়। ওঁর সঙ্গে কথা বলবার কেউ নেই, খেলার কোন সঙ্গী ওঁর নেই, সুখ-দুঃখের অংশ নেবারও কেউ পৃথিবীতে ওঁর নেই। অমন নিঃসঙ্গ হয়ে কি কেউ থাকতে পারে। আমাদের দিন কেমন হাসি-খেলায়, গল্প-গুজবে, মিলন-বিরহে কেটে যাচ্ছে। সময়ের গতির কথা আমাদের মনেই হয় না।

একেই ত বলে জীবন! নিশ্চয় পর্ব্বত বেচারা আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, আমাদের ব্যস্ত সমস্ত জীবনের উপর ঈর্ষ্যা করছেন। আমাদের সঙ্গে মিশতে যদি অনুরোধ করি, আনন্দে প্রাণ তাহ'লে ওঁর ভরে যাবে। অন্তরীক্ষের নির্জ্জনতা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করতে পারলে নিজেকে উনি ধন্য মনে করবেন! ওঁর নির্জ্জনতা দেখে সত্যই মায়া হয়। এস ওঁকে নিমন্ত্রণ করতে একজন দূত পাঠান যাক্।

বিচক্ষণ মিষ্টভাষী এক তোতাকে দূত মনোনীত করে গাছেরা এভারেষ্ট পর্ব্বতের কাছে পাঠালে। উড়তে উড়তে আধমরা হয়ে সে বেচারা শেষে পর্ব্বতের চূড়ার কাছে গিয়ে পৌছুলো। রোজকার নিয়মমত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে এভারেষ্ট পর্ব্বত সুদূর নিহারিকার দিকে চেয়েছিলেন। কি প্রশ্নের উত্তরের আশা সেখান থেকে যে তিনি করছিলেন তা তিনিই জানেন। একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্ণিস করে তোতা গিরিরাজকে তার দৌত্যের বিষয় অবহিত করলে, আর বল্‌লে সামান্য একটু নম্রতা স্বীকার করে যদি আমাদের সঙ্গে আপনি মেলামেশা করেন তা হলে জীবনটা আপনার কাছে এত নির্জ্জন আর নিরানন্দ বলে মনে হবে না। হেসে-খেলে গল্প-গুজব করে আনন্দে আপনি কাল কাটাতে পারবেন। পাখীরা গান গেয়ে আপনার চিত্ত-বিনোদন করবে, তরুণী বনবালারা বিলোল কটাক্ষ হেনে আপনার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করবে। ঋতুরাজের আবির্ভাবে দেহ আপনার পত্রে-পুষ্পে রঙীন হয়ে উঠবে। বিষাদের শুভ্র আবরণ আর আপনার দেহে দেখতে পাওয়া যাবে না।

তোতার কথা শুনে গিরিরাজ ক্ষণেকের তরে তাঁর সমুদ্রের মত গভীর চক্ষু দুটীকে আকাশ থেকে নামিয়ে বক্তার সন্ধান করলেন। অনেক চেষ্টার পর তোতাকে তিনি দেখতে পেলেন। সে বেচারা সভয়ে গম্ভীর মুখে একান্ত মিনতির সঙ্গে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছিল। আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এক একবার

গিরিরাজের মুখের দিকে চাইছিল। বিষাদ এবং করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে গিরিরাজ বললেন, "হে সুকণ্ঠ তোতা। আমার মঙ্গলের চিন্তায় এতটা আয়াস স্বীকার করে, আর নিজেকে এতটা বিপন্ন করে তুমি যে এখানে এসেছ, তার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তোমার বন্ধুরা আমার আনন্দ-বিধানের জন্য এতদূর সচেষ্ট জেনে আমি বড়ই সুখী হলুম। তোমাদের এই সহানুভূতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

তবে আমায় তোমরা একটু ভুল বুঝেছ। আর তাই আমার কথা ভেবে তোমাদের অন্তর বিমর্ষ হয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয় সমতল ভূমিতে নেমে তোমাদের সঙ্গে হাসি খেলায় মশগুল্ হতে আমায় তোমরা অনুরোধ করছ।

চিরকাল যে আমি এখানেই আছি তা নয়। আমিও একদিন তোমাদের মতই সমতল ভূমিতেই ছিলুম, কিন্তু প্রাণের দুর্ব্বার প্রয়োজন শেষে এই উর্দ্ধে আমায় নিয়ে এসেছে।

বর্ত্তমান জীবন বিষাদময় বটে, কেন না আমি একান্ত নিঃসঙ্গ, একান্ত একা। যাদের সঙ্গে এখন আমার কথাবার্ত্তা হয়, যাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় চলে, তারা থাকে উর্দ্ধে—ঐ নভোমণ্ডলে। আর যাদের সঙ্গে আমার বাল্যের সম্বন্ধ, তারা থাকে পরস্পরকে আকড়ে দূরে ঐ সমতল ভূমিতে; তাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু অন্তরের সম্বন্ধ নেই। উদ্দেশ্যহীন গল্প-গুজবে আর নিরর্থক হাসি-খেলাতেই তারা সময় কাটিয়ে দেয়; এর চেয়ে গুরুতর কোন বিষয়ের কথা তারা ভাবে না; ভাবতে ইচ্ছাও করে না; আর ভাববার অবসর তাদের নেই। সুদূর আকাশের ঐ যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, আর তাদেরও উর্দ্ধে অবস্থিত ঐ যে নীহারিকা, যেখানে নিত্য নূতন বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে, এ সবের বিষয় তাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ, অকিঞ্চিৎকর, আর সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞান বাড়াতে কিংবা মস্তক উন্নত করে অসীম ঐ নভোমণ্ডলকে পর্য্যবেক্ষণ করতে, তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তারা কোন চেষ্টাই

করে না। ক্ষণিকের তুচ্ছ হাসি-খেলা, ক্ষণিকের-আমোদ-প্রমোদ, ক্ষণিকের মিলন-বিরহ—এই নিয়েই তারা ব্যস্ত, আর এতেই তারা সন্তুষ্ট। সেইজন্যই তাদের জীবন এত সীমাবদ্ধ, এত সংকীর্ণ, এত সংক্ষিপ্ত। ক্ষণিকের তরে তারা আসে, ক্ষণিকের তরে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়, তারপর বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গহ্বরে তলিয়ে যায়। তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও পৃথিবীতে থাকে না। যুগ যুগ পূর্ব্বে, সুদূর এক অতীতে, পৃথিবীর শৈশব সময়ে আমিও ওদের মধ্যেই থাকতুম। ওদের মধ্যে কেন, আমার স্থান ছিল ওদেরও নীচে। ওরা সকলে হাসি ঠাট্টা, খেলা-ধূলা নিয়ে মশগুল্ থাকতো; আর আমি চুপটী করে বসে বসে কেবল ভাবতুম। আমায় কেউ গ্রাহ্যই করতো না।

আমার অন্তরে ছিল এক অগ্নিকুণ্ড। দিনরাত সেটী জ্বলতো, আর আকাশে উঠবার চেষ্টা করতো। তার জ্বালায় সর্ব্বদাই আমি অস্থির থাকতুম। যখন-তখন আমার দেহে ভীষণ কম্পন এসে উপস্থিত হত। আমার সেই অগ্নিকুণ্ডের হুঙ্কারে বিশ্ববাসী চমকে উঠ্তো—ভাবতো আমি একা থাকতে ভালবাসি বলে আমার দেহে একটী দৈত্য কিংবা শয়তান এসে প্রবেশ করেছে। আমার থেকে একটু দূরেই তারা থাকতো। হঠাৎ এক প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি হল। আমি আমার বর্ত্তমান কলেবর প্রাপ্ত হলুম। আমার প্রতিবেশীরা নিম্নে সুদূর ঐ সমতল ভূমিতেই পড়ে রইল।

অন্তরের আগুন আমার কিন্তু এখনও নিভেনি; আরও উর্দ্ধে উঠবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমার বাইরের ধৈর্য্য দেখে ভুল বুঝ না। আমার অন্তরের অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করে অনবরত জ্বলছে; আর আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তারই তাড়নায় অনুক্ষণ আকাশের দিকে আমি চেয়ে থাকি; গ্রহ-তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করি, আর নীহারিকার গুহ্য রহস্যের সন্ধান করি।

অন্তরের চিরজ্বলন্ত আগুনই এতদূর আমায় তুলে এনেছে, আর সেই আগুনই আরও উর্দ্ধে আমায় নিয়ে যাবে। সে আগুনের জন্ম যে ঐ নক্ষত্র-লোকে। আর সেখানে ফেরবার জন্য সে যে অক্লান্ত সাধনায় মশগুল্।

সমতল ভূমিতে ফিরে গাছ-গাছড়া কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে মিশতে আমায় অনুরোধ করা বৃথা। অন্তরের আগুন কখনই আমায় তা করতে দেবে না। একা এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুদূর নীহারিকার দিকে চেয়েই আমায় দিন কাটাতে হবে ; কেন না, যারা আমার অন্তরের সঙ্গী, আমার অন্তরের আগুনের সঙ্গী, তারা তো এই পৃথিবীতে থাকে না ; সুদূর ঐ নভোমণ্ডলেই যে তাদের স্থান।

ঈশ্বরের এমনই বিধান, আমার অন্তরের এই উর্দ্ধমুখী গতি বিশ্বের জন্য তোমাদের সকলের জন্য, অশেষ কল্যাণের কারণ হয়েছে। আমার বুকে ভর করে লতা-গুল্ম, গাছ-গাছ্ড়া দেখ কত উপরে উঠেছে। তুষার এবং মেঘের দৈত্যের সঙ্গে অবিরাম আমি যুদ্ধ করছি। গলিয়ে তাদের জলে পরিণত করছি। সেই জল থেকে বিশ্ববাসী জীবনের রস সংগ্রহ করছে। আমার শরীরের স্বেদ থেকে যে নির্ঝর ঝরছে, নদী বইছে, তাই থেকে পৃথিবী ফলে-ফুলে শোভিত হচ্ছে, তাই থেকে সে তার রূপ-রস-গন্ধ সংগ্রহ করছে। নিজে জ্বলছি, কিন্তু তোমাদের শীতল রাখছি। নিজে নির্জ্জনে জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জীবনকে আনন্দময়, ক্রীড়াময় করে তুলছি।

এতেই আমি সন্তুষ্ট। একা বসে অন্তহীন সাধনায় জীবন কাটাব এই আমার সঙ্কল্প ; এই আমার ভাগ্যলিপি। অন্য কোন প্রকারের জীবন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। তোমাদের সহৃদেশ্যের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে স্রষ্টার কাছে আমি প্রার্থনা করব। এখন তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও, আর আমার কথা তাদের শুনিয়ে দিও।"

পর্ব্বতের ভাব-বিভোর চক্ষু দু'টী আবার আকাশের দিকে ফিরে গেল বিস্ময়াভিভূত তোতা ভক্তির সঙ্গে কুর্ণিশ করে সমতল ভূমিতে ফিরে এল।

প্রদীপ ও পতঙ্গ

তখন অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি একা পাঠাগারে বসে লিখছিলুম। টেবিলে বড় একটী মোমবাতি জল্‌ছিল। তার শিখা জলন্ত আগুনের ফোয়ারার মত কেঁপে কেঁপে আকাশের দিকে উঠছিল।

হঠাৎ আমার লেখার কাগজের ওপর ছোট একখণ্ড মেঘের মত কাল একটা ছায়া এসে উড়ে বেড়াতে লাগলো। মনে বড় কৌতুহল হ'লো—আমি চোখ তুলে চাইলুম।

দেখলুম, একটী পতঙ্গ বাতির চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাল করে একবার আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—এই যেন তার ইচ্ছে।

ভাবলুম, এই অসহায় প্রাণীটী কি নির্ব্বোধ। কোথায় পৈতৃক প্রাণ নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে—তা নয় জলন্ত এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্যেই যেন ও পাগল। আগুনে একবার পড়লে কিন্তু আর ওকে ফিরিতে হবে না, ঘোরা-ফেরা সবই শেষ হ'য়ে যাবে।

বেচারার জন্যে প্রাণে আমার বড় মমতা হ'লো। ভাবলুম, নির্ব্বোধ ক্ষুদ্র একটী পতঙ্গ মাত্র। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই। জোর করেই ওকে আগুন থেকে বাঁচানো দরকার।

অতি সাবধানে আমি পতঙ্গটাকে নিজের হাতের মধ্যে নিলুম। সে যে পালাবার চেষ্টা করছিল বলে আমার এই সাবধানতা তা নয়—সে তো তখন আগুনের পিছনেই পাগল। কেউ তাকে ধরতে যাচ্ছে কি না—সেদিকে তার লক্ষ্য মাত্র ছিল না। সাবধান আমাকে হ'তে হ'লো—তাকে কোন আঘাত যেন না লাগে এইজন্যে, অন্য কোন কারণে নয়।

বাতি থেকে দূরে নিয়ে তাকে জানালার চৌকাঠের ওপর বসিয়ে দিলুম। ভাবলুম, প্রলোভন থেকে দূরে সরিয়েছি, এবার তার সুবুদ্ধি আসবে, এবার সে বাইরের বাগানে চলে যাবে, নির্বিঘ্নে সেখানে তার ক্ষুদ্র জীবনটা কাটাবে; আর কিছু হোক না-হোক আগুনে পুড়ে মরার যাতনা থেকে-তো অন্ততঃ অব্যাহতি পাবে। টেবিলে ফিরে আবার নিশ্চিন্ত মনে লেখায় মনোনিবেশ করলুম।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু সেই কাল মেঘটা পুনরায় আমার লেখার কাগজের ওপর ছুটোছুটি করতে লাগলো। চোখ তুলে চাইলুম। সেই বোকা পতঙ্গটা ফিরে এসেছে।

মনে বড় রাগ হ'লো। কি নিরেট বোকা আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা করে দূরে ওকে জানালার চৌকাঠে রেখে এলুম—আবার ফিরে এসেছে হতভাগা এই আগুনে পুড়ে মরতে। তারপর ভাবলুম, যাক্ রাগ করে আর কি হবে। কতটুকুই বা ওর বুদ্ধি। যাই এবার ঘরের বাইরে বাগানে ওকে রেখে আসি। সেখান থেকে হয়তো আর ফিরবে না।

তাই করলুম। সাবধানে হাতের মধ্যে নিয়ে ঘরের বাইরে বাগানে পতঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে এলুম। ভাবলুম, ইচ্ছে থাকলেও এবার আর ফিরতে পারবে না। পুনরায় নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

কি আপদ! আবার সেই কাল মেঘটা এসে আমার লেখার ওপর উড়তে লাগলো। এবার মেজাজ আমার ভয়ানক চটে গেল্। বাঁচবার পথ

খোলা থাকতেও জোর করে এসে আগুনে পুড়ে মরতে চায় এমন জীব তো কোথাও দেখিনি। একবার ভাবলুম, মরুক গে যাক্, ওর জন্যে ভেবে আর কি হবে। তারপর কিন্তু মনে হ'লো, অবলা প্রাণীটার ওপর রাগ করা শোভা পায় না। একটা গ্লাস চাপা দিয়ে রাতের মত বেচারাকে বন্ধ করে রাখি, সকালে ছেড়ে দিলে নির্ব্বিঘ্নে কোথাও চলে যাবে।

এবার পতঙ্গটাকে ধরে তার ওপর একটা গ্লাস উপুড় করে রাখলুম। মনে মনে বেশ একটু আত্মতুষ্টি অনুভব করলুম—যা হোক একটা কাজ করা গেল, একটা অবলা প্রাণীর জীবন রক্ষা হ'লো।

নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে এবার লেখায় মনোনিবেশ করলুম।

দু'চার ছত্র লিখেছি মাত্র, এমন সময় একটা করুণ অথচ অস্পষ্ট ক্রন্দনের ধ্বনি আমার কর্ণপটে এসে আঘাত করতে লাগলো। চমকে চোখ তুলে চাইলুম। কি অদ্ভুত মোহাবেশ। সেই পাগল পতঙ্গটা গ্লাসের দুর্ভেদ্য কারাগারের গায়ে তার ছোট ছোট পাখনা দিয়ে অবিরাম ভাবে আঘাত করছিল, আর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে করুণ সুরে কাঁদছিল। চেষ্টার তবু কিন্তু বিরাম নাই।

সমবেদনায় মনটা আমার ভরে গেল। যত্নে গ্লাসের কারাগার থেকে বের করে পতঙ্গটাকে আবার হাতে তুলে নিলুম। স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললুম "ওরে অবুঝ পতঙ্গ, তোকে বাঁচাবার জন্য আমি এত ফন্দী ফিকির করছি, তোর আগুনে পোড়বার জন্য এত আগ্রহ কেন বল দেখি? পোড়ার যন্ত্রণা যে অতি ভীষণ, ওরে হতভাগা! একবার ছেলে বেলায় আমার হাত আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আগুন দেখলেই গা আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে। তোর ক্ষুদ্র প্রাণে কি একটুও ভয়-ডর নেই, যে, তুই সেই আগুনে পোড়বার জন্য ছট ফট করছিস?

একান্ত মিনতির স্বরে পতঙ্গ বললে "ওগো দয়ার সাগর, আমায় বাঁচাবার

চেষ্টা আর করো না। আমি পাগল, আগুনে পুড়েই আমায় মরতে দাও। আমার মনের কথা ঠিক বোঝ না বলেই আমায় তুমি আটকে রেখেছ, তা না হলে রাখতে না। আগুনে পোড়বার জন্যেই আমি জন্মেছি, কেবল বেঁচে থাকবার জন্য আমার জন্ম হয়নি। আগুনে না পুড়লে আমার এই পতঙ্গ জীবনই বৃথা যাবে।

তুমি মনে কর আগুনে পুড়লে ভারী আমার কষ্ট হবে। এ তোমার মস্ত ভুল। এত বড় বিদ্বান তুমি, আর এই সোজা কথাটা বুঝলে না, পুড়তে যদি সত্যই আমার দুঃখ হ'তো, তাহলে পুড়তে আমি যেতুম কেন ?

তুমি মনে কর, আগুন থেকে বাঁচিয়ে তুমি আমার মস্ত উপকার করেছ। পণ্ডিত মশাই, এও তোমার ভুল। যতদিন আগুন থেকে দূরে থাকব, ততদিন প্রাণ আমার যাতনায় কেবল ছট ফট করবে, আর ততদিন আমাদ্বারা প্রকৃত কোন কাজ হবে না। আমারও না আর অন্যেরও না। তুমিই বল দেখি, অমন বেঁচে থাকায় আমার লাভ কি ? জীবনধারণ করলেই তো আর বাঁচা হয় না।

ওগো দরদী বন্ধু, দয়াকরে আমায় ছেড়ে দাও। আগুনের ঐ শিখায়, সৌন্দর্য্যের ঐ উৎসে আমায় ঝাঁপ দিতে দাও! ঐ দেখ কি প্রাণ মাতানো রূপের ছটায় বিশ্বে আলোকের অপরূপ লহর তুলে সে আমায় ডাকছে। ঐ দেখ নৃত্যের সহস্র ভঙ্গিমায় হেলে দুলে আমায় সে বলছে "ওহে প্রেমিক আমার, আমার রূপের এই জলন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জীবন তোমার সার্থক কর। তোমার প্রেমের ইন্ধনে আমার রূপের শিখাকে আরও উজ্জ্বল করে তোল। এস, তোমাতে আমাতে মিলে, প্রেমিক আর প্রেমাস্পদে মিলে, সম্মিলিত মহিমায় আমাদের বিশ্বকে একবার চমকে দিই !"

পতঙ্গ স্তব্ধ হল। বুঝলুম, পাগলকে আটকে রেখে কোন লাভ হবে না। আগুনে পোড়বার জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে, আগুনে পুড়েই বিধাতার দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে।

"যাও বাছা, অন্তর যে পথে তোমায় নিয়ে যায়, সেই পথেই তুমি যাও! আমার আশীর্ব্বাদ, ভগবান্ তোমার জীবন সার্থক করুন!" পতঙ্গটীকে আমি তার গ্রাসের কারাগার থেকে মুক্ত করলুম। পাগলের মত সেই অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দিয়া সে পড়লো। ক্ষণিকের তরে অগ্নিশিখা বর্দ্ধিত তেজে জ্বলে উঠলো। পর মুহূর্ত্তে পতঙ্গের প্রাণহীন দেহ টেবিলের উপর এসে পড়লো।

ঠং করে দেয়ালের ঘড়িতে রাত একটা বাজার শব্দ শোনা গেল। আপন মনে আমি বললুম "লেখা বাকী আছে, এখন শুতে গেলে চলবে না। পতঙ্গের কাছে অন্ততঃ আমি হার মানবো না।" আমি আমার পাগলামিতে, অর্থাৎ লেখার কাজে মনোনিবেশ করলুম।

একটী স্বপ্ন

অপূর্ব্ব এক স্বপ্ন দেখলুম! বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমি যেন একদল লোকের সঙ্গে মার্চ্চ করে চলেছি; পথ অতিক্রম করতে করতে আমরা লোকালয়ে এসে উপস্থিত হলুম। রাস্তার পাশেই মনোরম এক সরাইখানা। দলের কয়েকজন বল্‌লে, "যথেষ্ট পরিশ্রম করা হয়েছে। আর পথ চলার কষ্ট সহ্য করতে পারি না। এইখানেই যাত্রা শেষ করা যাক!"

দল আমাদের বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সেই সরাইখানাতেই রয়ে' গেল। অবশিষ্ট আমরা সকলে আবার পথ চলতে লাগলুম। আমার মনে

অনুশোচনা এসে উপস্থিত হ'ল। ভাবলুম "পথ চলা কি কষ্টকর ব্যাপার! সরাইখানাতে থেকে গেলেই সব গোল চুকে যেতো!" শেষে কিন্তু স্থির করলুম, "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক্!"

অনেকক্ষণ পথ অতিক্রম করবার পর আমরা আবার এক সরাইখানার সাম্‌নে এসে উপস্থিত হলুম। এই দ্বিতীয় সরাইখানাটী প্রথমোক্ত সরাইখানার চেয়েও মনোমুগ্ধকর এবং আরামদায়ক বলে মনে হ'ল। আবার আমাদের দলে মতভেদের সৃষ্টি হ'ল। একদল সেইখানেই সফর শেষ করবার মত দিল, আর একদল বল্‌লে, "না, পথ এখনও শেষ হয় নি, আবার যাত্রা আরম্ভ করা যাক্।" যে-দল চলার পক্ষপাতী ছিল, তারা আবার চলতে আরম্ভ করলে। আমি এই দ্বিতীয় দলের সঙ্গেই রইলুম। যাত্রা রীতিমত ভাবে আরম্ভ করবার পর আবার আমার মনে হ'ল, "পথ চলা কি কষ্টকর ব্যাপার! সরাইখানাতে থেকে গেলেই সব গোল চুকে যেতো!" তারপর কিন্তু আবার ভাবলুম, "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক্।"

অনেকক্ষণ পথ চলবার পর আবার আমরা এক সরাইখানার সাম্‌নে এসে উপস্থিত হলুম। আগের মত এবারও কয়েকজন লোক দল ছেড়ে সেখানেই থেকে গেল। আমি কিন্তু চলন্ত দলের সঙ্গেই রইলুম। পথ চলতে চলতে আবার আমার মনে হ'ল, পথ চলা কি কষ্টকর ব্যাপার। সরাইখানাতে থেকে গেলেই সব গোল চুকে যেতো!" আবার ভাবলুম, "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক্!"

এই রকম করে সরাই-এর পর সরাই আমরা অতিক্রম করতে লাগলুম। দল ক্রমেই হালকা হতে লাগলো। প্রত্যেক "মনজেলে"র (stage) পর সেই একই কথা আমার মনে আসতো, "পথ চলা কি কষ্টকর ব্যাপার!

সরাইখানাতে থেকে গেলেই সব গোল চুকে যেতো।" তারপর ভাবলুম, "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক্।" স্থির মনে তারপর আবার পথ অতিক্রম করতুম।

প্রান্তর পার হয়ে মস্ত এক পর্ব্বতের সামনে এসে আমরা উপস্থিত হ'লুম। এত উঁচু সে পর্ব্বত যে তার চূড়া দেখতে পাচ্ছিলুম না। পর্ব্বতের পাদদেশে সুন্দর এক সরাইখানা, আরামের নানাবিধ সামগ্রীতে ভরপূর। সফর শেষ করবার লোভ এবার সকলেরই হ'ল। অধিকাংশ লোকই বললে, "বেশ জায়গায় আসা গেছে। আর কষ্ট করে দরকার নেই। আরামে এইখানেই দিন কাটান যাক্। খাবার, পরবার, জীবনটাকে উপভোগ করবার সুন্দর ব্যবস্থা এখানে আছে।" তারা সেখানেই থেকে গেল। আমরা কেবল তিনটি-মাত্র প্রাণী আবার পথ চলতে আরম্ভ করলুম।

এবার পর্ব্বতের দুর্গম পথের সঙ্গে দেখা। আগে থেকেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পথ চলা এখন ভয়ানক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। আবার আমার মনে অনুশোচনা এসে উপস্থিত হ'ল, "পথ চলা কি কষ্টকর ব্যাপার! সরাইখানাতে থেকে গেলেই সব গোল চুকে যেতো।" তারপর মনটাকে দৃঢ় করে ভাবলুম, "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক্!" একমনে তখন উপরে উঠতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ চলবার পর, আমার অবশিষ্ট সঙ্গী দু'টী বললে, "বৃথা কষ্ট করে আর লাভ নাই। চল সঙ্গীদের কাছে সরাইয়ে ফিরে যাই।" আমি বললুম, "না, চলতে আরম্ভ যখন করেছি তখন আর ফিরবো না।" সঙ্গীরা পাগল মনে করে আমার সঙ্গ ছেড়ে সরাইয়ের উদ্দেশে ফিরে গেল। এবার একাই আমি পথ চলতে লাগলুম। বার বার আমার মনে হতে লাগলো আর যে পারি না। কত কষ্ট আর সহ্য করা যায়! সরাইয়ে ফিরে গেলেই সব আপদ চুকে যেতো। আবার কিন্তু ভাবলুম, না, না, ওরকম করলে চলবে

না। চলবার সঙ্কল্প যখন করেছি তখন চলাই যাক। শরীর এবং মনের সমস্ত শক্তিকে পুঞ্জিত করে উপরে উঠতে লাগলুম।

অবর্ণনীয় পথশ্রমের পর যখন চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন পা দু'টী আমার ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে, শ্রান্তিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছে, এমন অবসন্ন হয়েছি যে, সংজ্ঞা লোপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কাতর দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাইলুম পর্ব্বতের চূড়ার দিকে; আশার একটু আলো দেখবার প্রত্যাশায়। এ কি? পর্ব্বতচূড়ায় কি মনোহর ঐ প্রসাদ? কি বিচিত্র তার বাগানের শোভা! ফল-ফুলের কি বিচিত্র গন্ধার স্থানটিকে আলোকিত করে রেখেছে। অবর্ণনীয় আনন্দে অন্তর আমার ভরে গেল। পুলকের শিহরণে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। শ্রান্তি চলে গেল! প্রাণভরা আগ্রহ নিয়ে আমি সেই প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলুম।

অচিরে মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদ তোরণের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হলুম। দিব্যকান্তি, জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ একান্ত স্নেহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলেন। আমাকে সম্বোধন করে মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, "মারহাবা, খোশ আমদি, খায়ের আমদি, স্বাগত! তোমার আগমন শুভ হোক। সাধনা তোমার সার্থক হয়েছে বন্ধু। অন্তরের সমস্ত প্রীতি দিয়ে তোমায় অভিনন্দিত করছি। পুলকের গভীর আবেশে আমি তাঁর প্রসারিত আমার হাতের মধ্যে চেপে ধরলুম। স্বর্গীয় মাধুরীভরা অপূর্ব্ব হস্ত এক অভিনন্দন সঙ্গীত আমার কানে সুধা বর্ষণ করতে লাগলো। আনন্দের প্রবাহে সমস্ত অন্তর আমার কেঁপে উঠলো।

ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক

হাফেজা ম্যায় খোর ও রিন্দী কুন ও খোস বাস, ওয়ালে,
দামে তাজওয়্যির মকুন চুঁন দিগরান কোরাণরা!
অর্থাৎ—হে হাফেজ মধু খাও, আমোদ কর, আর সুখে থাক;
ধার্ম্মিকদের মত কিন্তু কোরাণকে ভণ্ডামির আবরণ করো না।

—হাফেজ।

যা বলতে হয় বলুন, আমি কিন্তু ধার্ম্মিকের চেয়ে অধার্ম্মিককেই পছন্দ করি, তা সে যে ধর্ম্মেরই হোক না কেন। আমি যে এ বিষয় একা নই, হাফেজের উপরে উদ্ধৃত পদটী থেকেই তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু হাফেজের চেয়েও অকাট্য দলিল আমি প্রাচীন ইতিহাস থেকে দিচ্ছি। হজরৎ মুসার (Moses) সময় কোন সহরে দুইটী লোক বাস করতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল একান্ত ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্, আর অন্যটী ছিল অনাচারী মাতাল। হঠাৎ একদিন দুই জনেরই মৃত্যু হল। মুসা ধার্ম্মিক প্রবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির হ'বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় ভগবানের নিকট থেকে প্রত্যাদেশ এলো "ধার্ম্মিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেও না, মাতালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাও।" মুসা অবাক হয়ে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন "এরূপ বিপরীত আদেশ আপনি কেন দিচ্ছেন?" খোদা উত্তর দিলেন "হে মুসা, আমার আদেশ ন্যায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ধার্ম্মিক লোকটী বাহ্যতঃ আচারে নিষ্ঠ হলেও, অন্তর ওর বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারে ভরা ছিল। আর মাতালটী বাহ্যতঃ অনাচারী হলেও অন্তরে কিন্তু ওর নিজের ব্যবহারে বড়ই অনুতপ্ত থাকতো, আর বিনয় এবং দয়ায় ওর প্রাণ ভরা থাকতো।" মুসা ধার্ম্মিককে ছেড়ে সেই

মাতালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই গেলেন। লোকে তাঁর কাণ্ড দেখে অবাক হলো।

উপাখ্যানটীর ভিতর মস্ত বড় একটী সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। ধর্ম্ম নিয়ে যাঁরা বিশেষ আড়ম্বর করেন, তাঁহার মধ্যে তিনটী গুণের অভাব আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। একটী হচ্ছে বিনয়ের, দ্বিতীয়টী হচ্ছে charity বা দয়া-দাক্ষিণ্যের, আর তৃতীয়টী হচ্ছে catholicity বা সাধারণ সহানুভূতির। এই সব আসল জিনিষ ছেড়ে কতকগুলি বাহ্যিক নিয়ম পালন করে তাহারা মনে করেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁরা বিশেষ একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছেন। আর নিজেদের সঙ্কীর্ণতা ভগবানের কাঁধে চাপিয়ে তাঁরা প্রচার করেন, যারা আচার-অনুষ্ঠান মানে না, তাদের উপর তিনি হাড়ে-হাড়ে চটে আছেন, আর সুযোগ পেলে তিনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে কোন মতে ত্রুটী করবেন না।

মোট কথা, তাঁরা ভগবানকে একজন বড় রকমের পাড়াগেঁয়ে জমিদার বানিয়ে বসেছেন; আর নিজেদের বানিয়েছেন তাঁর খাস মোসাহেব। আর অনাচারীদের বানিয়েছেন তাঁর বিদ্রোহী প্রজার দল যাদের সঙ্গে বিবাদ করাই হচ্ছে প্রভুভক্ত মোসাহেবের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

তাদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব যে পৃথিবীতে বিশেষ অনর্থ ঘটিয়েছে তা দেখাবার জন্য ইতিহাসের নজির আনবার দরকার নাই। সেদিন কলিকাতা সহরে আমাদের চোখের সামনে যে লোমহর্ষণ হত্যাভিনয় হ'লো, তাই তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত!

ভগবান তার সৃষ্টির বিষয় আমার সঙ্গে কখনও সলা পরামর্শ করেন নি, সুতরাং তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা আমি করতে পারলুম না। তবে গোঁড়া মহোদয়ের ব্যাখ্যা যে ভ্রমাত্মক, এবং হাস্যাস্পদ অথচ Tragic সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভগবান্ যদি সব মানুষকেই এক পথে চালাতে ইচ্ছা করতেন,

তাহ'লে জগতে এই বিভিন্নতা আর বিচিত্রতা কখনও থাকতো না। আর স্বয়ং যখন তিনি আবহমানকাল এসব থাকতে দিয়েছেন, তখন মতভেদের জন্য মানুষকে ঘৃণা করা কিংবা তার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করা কখনই তাঁর অভিপ্রেত হতে পারে না। আমি যতদূর জানি এরূপ আচরণ কোন ধর্ম্মেই সমর্থন করে না। এই অসহিষ্ণুতার ভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়েছেন ঐ তথাকথিত ধার্ম্মিকের দল, যাঁদের আমি গোঁড়া ধার্ম্মিক বলেছি।

এ কিছু তাঁদের নূতন ব্যবসায় নয়। চিরকালই তাঁরা ভগবানের প্রেমকে (Love of God) মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করবার একটা টেঁকসই অজুহাত রূপে ব্যবহার করে এসেছেন। মানব জাতির কোন প্রকৃত বন্ধুকেই তাঁরা নির্য্যাতন করতে ক্রটী করেন নি। পৃথিবীর প্রত্যেক মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের তাঁরা প্রাণান্ত হয়ে শক্রতা সাধন করেছেন, আর সর্ব্বত্রই তাঁরা অন্ধ জড়-শক্তির পোষাক হয়ে বিশ্বের প্রাণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা এই সনাতন ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুর আশা করতে পারি না।

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মঙ্গলময় যা কিছু হয়েছে, ঐ তথা-কথিত অনাচারী এবং অধার্ম্মিকদের সাহায্যেই হয়েছে। শাক্য-মুনি এদের সাহায্যেই তাঁর অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, যীশুখৃষ্ট এদের সাহায্যেই তাঁর প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, চৈতন্যও এদের সাহায্যেই তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যা বাঙ্গলাদেশে বহিয়েছিলেন।

অনাচারীর কোমল, নম্র এবং ভাবপ্রবণ হৃদয়ের মধ্যে যে ধর্ম্মের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে, তাই সময় পেলে দেবত্বের বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। ক্লান্ত মানব-সন্তান তখন আর সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম এবং শান্তি লাভ করে। গোঁড়া ধার্ম্মিকের প্রাণ কিন্তু পাথরের মত কঠিন। তার উপর মাটি ফেলে, সার ছড়িয়ে ছোট ছোট গাছ জন্মান যায় বটে, কিন্তু কোন ছায়ালো গাছ সেখানে শিকড় গাড়তে পারে না।

তাই বলি ধর্ম্মের বাহ্যাবরণ দেখে আমাদের ভোলা ঠিক নয়। মানুষের অন্তরটা দেখা দরকার, আর সেই অন্তরের মাপকাটি দিয়েই মানুষের যাচাই করা দরকার।

হেরেম মহিলা

আড্রিয়ানোপল, ১৮ই এপ্রিল।

কাউণ্টেস অফ—

প্রিয় ভগিনী আমার,

সেদিনকার জাহাজে তোমায় এবং অন্যান্য বন্ধুদের আমি চিঠি পাঠিয়েছিলুম। আবার কবে চিঠি পাঠাবার সুযোগ পাব তা বিধাতাই জানেন। লেখবার লোভ কিন্তু আমি দমন করতে পারছি না, যদিও খুব সম্ভব, আমার এই চিঠি দু'মাস ধরে পড়ে থাকবে।

আসল কথা কি জান? গতকাল আমি এমন সব মজার জিনিষ দেখেছি, যাদের খেয়ালে মাথা আমার এখনও ভরে আছে। আমার মনের শান্তির জন্য অন্ততঃ সেই সব কোন প্রকারে প্রকাশ করা একান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছে। যাক আর বেশী ভূমিকার দরকার নেই। আমার গল্পটাই এখন তোমায় বলি।

সুলতানের প্রধান উজিরের বেগম সাহেবা সেদিন আমায় এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এমন সৌভাগ্য পূর্ব্বে কোন খৃষ্টানের হয়নি। আমি

স্বভবতঃই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর আতিথেয়তার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলুম।

যে পোষাকে তিনি লোককে সাধারণতঃ দেখে থাকেন সে পোষাক পরে গেলে তাঁর কৌতূহলে মিটবে না বলেই আমার মনে হল। আমার বেশ জানা ছিল, তার কৌতূহল নামক মনোবৃত্তির কাছেই এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের জন্য আমি ঋণী। ভেবে চিন্তে, ভিয়েনার দরবারী পোষাক পরে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম। ভিয়েনার সে পোষাক বেশী জমকালো। আদব-কায়দার খুটি-নাটি নিয়ে যাতে গোলযোগ না বাধে সেই জন্য, বে-সরকারী ভাবে, একটী তুর্কী গাড়ীতে চড়ে সঙ্গে একটীমাত্র পরিচারিকা আর অনুবাদকের কাজ করবার জন্য একটী গ্রীক মহিলাকে নিয়ে বেগম সাহেবার কাছে উপস্থিত হলুম।

মহলের দেউড়িতে কৃষ্ণকায় একটী খোজা আমাদের অভ্যর্থনা করলে। একান্ত যত্ন এবং সম্মানের সঙ্গে সে আমায় গাড়ী থেকে নামালে। তারপর অনেকগুলি প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে সে পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা পরিচারিকারা দু'ধারে লাইন বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকলের শেষের প্রকোষ্ঠে বেগম সাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কাল রং-এর একটী আঙ্গারখা পরে তিনি শোফার উপর বসেছিলেন। আমায় দেখে সসম্মানে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর কয়েক পদ অগ্রসর হ'য়ে আমার অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে তাঁর পাঁচ ছয় জন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ সৌজন্যের সঙ্গে তাঁদের সাথে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বেগম সাহেবাকে একজন অতি উচ্চধরণের মহিলা বলেই আমার মনে হল। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর মহলে বাহ্যিক আড়ম্বরের অভাব দেখে আমি একটু আশ্চর্য্য হলুম। আসবাবপত্র সবই খুব সাধারণ ধরণের। পরিচারক ও পরিচারিকাদের সংখ্যাধিক্য আর তাদের পোষাকের

জাঁক-জমকেই আমাকে গৃহকর্ত্রীর পদগৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এই ব্যাপার একটী ছাড়া আর সবের মধ্যেই মিতব্যায়িতার ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত ছিল।

আমার মনের ভাব বেগম সাহেবা বুঝতে পেরেছিলেন। আমায় বোঝাবার জন্য তিনি বললেন, তাঁর ভোগের বয়স চলে গিয়েছে; আমোদপ্রমোদ তাঁর আর শোভা পায় না। এখন তিনি দান-ধ্যানেই তাঁর সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন। খোদার তুষ্টিসাধনই হচ্ছে এখন তার জীবনের ব্রত। এ সব তিনি বললেন বটে, তাঁর কথার মধ্যে কিন্তু আত্মশ্লাঘায় কণামাত্র ছিল না।

বেগম সাহেবা আর তাঁর স্বামী এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করেন। স্বামী অপর কোন স্ত্রীলোকের উপর ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করেন না। উৎকোচ প্রভৃতি তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রীদের কথা স্মরণ করলে তাঁর এই সংযমে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না। এ সব বিষয়ে তিনি এত সাবধান যে, মিঃ ওর (লেখিকার স্বামী) প্রদত্ত মামুলী নজরাণা নিতেও প্রথম প্রথম তিনি যথেষ্ট ইতস্ততঃ করেছিলেন। অনেক করে তাঁকে যখন বোঝান হল যে, প্রত্যেক রাজদূতই পদগ্রহণের সময় এইরূপ নজরাণা দিয়ে থাকেন, আর দেশের প্রথা অনুসারে এটী তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। তখন তিনি আমার স্বামীর নজরাণা গ্রহণ করলেন।

খানা না আসা পর্য্যন্ত বেগম সাহেবা বিশেষ সৌজন্যের সঙ্গে আমার চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন রকমের খাদ্য পর পর আমাদের সামনে উপস্থিত করা হলো। সে সবের সংখ্যা করাই কঠিন! সে দেশের রন্ধন-প্রণালীর নিয়ম অনুসারে সেই সব খাদ্য অতি সুন্দররূপেই প্রস্তুত হয়েছিল।

তুমি হয়তো এদেশের পাক-প্রণালীর যথেষ্ট নিন্দা শুনে থাকবে। আমি তো নিন্দা করবার কিছু পেলাম না। এ দেশের খাদ্যের বিষয় আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিন সপ্তাহ ধরে আমাকে বেলগ্রেডের এক আফেন্দির

অতিথি হয়ে থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি বিচিত্র রকমের মুখরোচক বিভিন্ন খাদ্য আমায় খাইয়েছিলেন। তাঁর নিজের পাচকই সে সব খানা তৈয়ের করেছিল।

প্রথম সপ্তাহে বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গেই আমি সে সব খেয়েছিলুম। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে, দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার একটু অরুচি হ'য়েছিল। আমি তখন তাহাদের দিয়ে আমাদের দু'একটী ইংরাজী খাদ্য তৈয়ের করিয়ে নিতুম, আর গৃহস্বামীর প্রস্তুত খানার সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে আহার করতুম।

আমার কিন্তু মনে হয়, কারণ এর অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়। একজন ভারতবাসী এই দুই রকমের খাদ্যের চেয়ে তার নিজের দেশের খাদ্যকেই বেশী পছন্দ করবে। অবশ্য এদেশের Sauce (চাটনী, আচার প্রভৃতি, একটু কড়া রকমেরই হয়ে থাকে, আর রোষ্ট (Roast) কে এরা একটু কড়া করেই পাকিয়ে থাকে। গরম মশলার ব্যবহারও একটু অতিরিক্ত বলেই মনে হয়।

এদেশের সুপ (সুরুয়া) সবে শেষে দেওয়া হয়ে থাকে। মাংসের রকমারী আমাদের দেশের চেয়ে এখানে কোন অংশে কম নয়। আমার ভোজটা বেগম সাহেবার আশানুরূপ হয়নি। প্রত্যেক ডিস থেকে কিছু কিছু খাবার জন্য তিনি আমায় যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

খাওয়া শেষ হবার পর কফি এবং আতর উপস্থিত করা হল। অতিথির গায়ে আতর লাগান হ'চ্ছে এখানকার একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। দুজন পরিচারিকা নতজানু হ'য়ে সযত্নে আমার মাথায়, কাপড়ে এবং রুমালে আতর লাগিয়ে দিলে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বেগম সাহেবা তাঁর সহচরীদের নাচ এবং সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে আদেশ করলেন। Guitar (সেতার যন্ত্র) হাতে

করে তারা নাচতে এবং গাইতে লাগলো। বেগম সাহেবা তাঁর সহচরীদের নৈপুণ্যের অভাবের জন্য আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করলেন। বললেন, কলা-বিদ্যায় তাদের পারদর্শী করবার জন্য তিনি কোন চেষ্টাই করেন নি।

কিছুক্ষণ পর ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেগম সাহেবার নিকট থেকে বিদায় নিলুম। যে ভাবে খোজা আমায় অন্দরে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই আবার বাইরে রেখে গেল। আমি সোজাসুজি বাড়ী ফিরে আসারই মতলব করেছিলুম। আমার গ্রীক সঙ্গিনী কিন্তু "কায়াইয়া" সাহেবের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। প্রকৃত ক্ষমতার হিসাবে তিনি প্রধান মন্ত্রীর চেয়েও বড়। বাহ্যতঃ যদিও উজিরের ক্ষমতা বেশী, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু সমস্ত ক্ষমতাই এই "কায়াইয়া" সাহেবের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। উজির বেগমের মহলে আমি এত অল্প আনন্দ পেয়েছিলুম যে, অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। আমার সঙ্গিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কিন্তু আমি উপেক্ষা করতে পারলুম না। আর এখন, অনুরোধ রেখেছিলুম বলে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি।

"কায়াইয়া" বেগমের মহলে দেখলুম সব জিনিষই একটু ভিন্ন রকমের। একজন ধর্ম্মপ্রাণা প্রবীণা এবং আর একজন সুন্দরী তরুণীর জীবনযাত্রার মধ্যে যে কত প্রভেদ তা বাড়ীটা দেখেই বুঝতে পারলুম, পরিষ্কার এবং ঝর ঝরে, বহুমূল্য আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত সে বাড়ী।

ফটকে পৌছুতেই দুইজন কৃষ্ণকায় হাবসী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলে। লম্বা এক গ্যালারির মধ্য দিয়ে তারা আমায় নিয়ে গেল। গ্যালারির দু'ধারে সুন্দরী যুবতীরা দাঁড়িয়েছিল। তাদের সুবিন্যস্ত বেণী প্রায় পা পর্য্যন্ত এসে পৌছেছিল। তারা সকলেই চাঁদির কাজ করা পাতলা ডামাস্ক রেশমের কাপড় পরে ছিল। ভদ্রতার নিষ্ঠুর বিধি আমাকে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ভাল করে পরীক্ষা করতে দিলে না। সে জন্য আমার যথেষ্ট দুঃখ হ'চ্ছিল।

কিন্তু মহলের প্রধান প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে সে দুঃখ একেবারে ভুলে গেলাম। সে প্রকোষ্ঠটীকে Pavilion বলা যেতে পারে। চারিদিকে তার সোনালি সার্শি দিয়ে ঘেরা। সার্শিগুলি সবই প্রায় খোলা ছিল। আর পাশের গাছগুলো স্নিগ্ধ ছায়ায় স্থানটীকে আবৃত করে রেখেছিল। যুঁই আর হানিসাকল ফুল সুমধুর গন্ধে স্থানটীকে আমোদিত করে রেখেছিল। প্রকোষ্ঠের নিম্নাংশে একটী শাদা মারবেলের ফোয়ারা ছিল। তার জল মৃদু-মধুর বাদ্যের তানে তিন চারিটী ধারায় আনন্দময় জলাধারে লাফিয়ে পড়ছিল। জলের স্নিগ্ধতা ফুলের গন্ধকে আরও মধুর করে তুলছিল। ছাদে নানা রকমের ফুলের ছবি আঁকা ছিল; সোনার সাজি থেকে তারা ঠিক যেন গড়িয়ে পড়ছিল।

তিন ধাপ উঁচু এক মসনদের উপর "কায়াইয়া" বেগম বসেছিলেন। বেদীর উপর মহামূল্য ইরাণী গালিচা বিছানো ছিল। কারুকার্য্য-খচিত সাদা সাটিনের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বেগম সাহেবা বসে ছিলেন। তাঁর পায়ের কাছে দু'টী বালিকা বসেছিল—তাদের মধ্যে যে বড, তার বয়স প্রায় বার বৎসর। তাদের চেহারা ঠিক স্বর্গের দেবীদের মত। তাদের বেশভূষার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়; অলঙ্কার দিয়ে তাদের সমস্ত শরীর মোড়া ছিল। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেরেমের (বেগম সাহেবার নাম) সামনে তারাও কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অনুপম সৌন্দর্য্যের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানিতে আমি শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের দেখেছি, তাঁর সৌন্দর্য্য তাদের অনেক উর্দ্ধে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, এমন চিত্ত-বিভ্রমকারী সৌন্দর্য্য জীবনে কখনও আমি দেখিনি! তাঁর রূপের সামনে দাড়াতে পারে, এমন কোন সুন্দরীর কথা আমার স্মরণে আসে না।

আমার অভ্যর্থনার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর তাঁর দেশের রীতি অনুসারে বুকের উপর হাত রেখে আমায় তিনি অভিবাদন করলেন। তাঁর সেই

সৌজন্যটুকুর মধ্যে এমন এক স্বাভাবিক মহিমা ছিল যা কোন শাহী-দরবার থেকেও কেউ শিখতে পারে না। আমার আরামের জন্য পরিচারিকাদের তিনি তাকিয়া প্রভৃতি যথাস্থানে রাখবার জন্য আদেশ করলেন, আর বিশেষ যত্ন করে আমায় কোণের আসনেই বসালেন—কেন না সেই হচ্ছে সম্মানের শ্রেষ্ঠ স্থান! আমার পরিচিত গ্রীক মহিলাটী তাঁর রূপের যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বেই করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমায় স্বীকার করতে হচ্ছে, তাঁর সেই রূপ প্রত্যক্ষ দেখে আমার মন এমন চমৎকৃত হয়েছিল যে, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হয়ে আমি তাঁর দিকে কেবল চেয়েই ছিলুম। তাঁর মুখাবয়বের কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য! চেহারার কি চমৎকার মানানসই গঠন! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি নিখুঁত মিল। কৃত্রিমতার স্পর্শশূন্য রং-এর কি মধুর লালিমা! তার সেই মৃদু-মধুর হাসির কি মনমোহিনী শক্তি—আর তাঁর নয়ন যুগল? বড় বড় কাল কাল সেই চোখ দুটী! নীল চোখের মধুর আবেশময় ভাব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই বিরাজ করছিল! তাঁর মুখাবয়বের প্রত্যেক ভঙ্গিমায় নিত্য নূতন মাধুর্য্য স্ফুরিত হচ্ছিল!

বিস্ময়ের ভাব একটু প্রশমিত হলে পর আমি তাঁর চেহারাটীকে খুব ভাল করে দেখতে লাগলুম, উদ্দেশ্য: যদি কোন খুঁত তার মধ্যে বার করতে পারি। আমার সে চেষ্টার কিন্তু কোনই ফল হল না। পরীক্ষান্তে বেশ বুঝলুম, সাধারণের ধারণা যে নিখুঁত সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে মনোরঞ্জক নয়, এটা একটা ভ্রান্তি মাত্র! শুনেছি শিল্পী Apellis নাকি বিভিন্ন চেহেরা থেকে তাদের সুন্দরতম অংশগুলি নিয়ে একটি নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি সৃষ্টি করবার জন্য করেছিলেন! তিনি যার জন্য চেষ্টা মাত্র করে করেছিলেন প্রকৃতি এই বেগম সাহেবার চেহারায় তা সত্যই সৃষ্টি করেছেন।

এই অতুলনীয় রূপের সঙ্গে বেগম সাহেবার ব্যবহার আবার এমন মধুর এবং সুন্দর, তাঁর ধরণ-ধারণ এমনই মহিমান্বিত অথচ স্বাভাবিক, তাঁর

আচরণ এমনই আড়ষ্টতাশূন্য এবং অকৃত্রিম যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস. যদি হঠাৎ কোনরূপে তিনি ইউরোপের সভ্যতম দেশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তা'হলে একথা কেউ ভাবতেও পারবে না যে, তিনি রাজরাজেশ্বরী হবার জন্ম জন্মগ্রহণ করেন নি, আর সেই মহিমান্বিত পদের জন্ম জন্মকাল থেকে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়নি। মোট কথা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীদের কেউ তাঁর সামনে গণনার মধ্যেই আসতে পারেন না।

তিনি চাঁদির কাজ করা সোনালী ব্রোকেডের একটী কাবা (caftan) পরেছিলেন। পোষাকটী তাঁর শরীরের গঠনের খুবই মানানসই হয়েছিল। তাতে তাঁর বক্ষদেশের সৌন্দর্য্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। পাতলা গজ-সিল্কের একটী শেমিজ মাত্র সেই বক্ষদেশকে ঈষৎ ঢেকে রেখেছিল।

বেগম সাহেবা হালকা পিঙ্ক ও সবুজ রংএর একটী পায়জামা পরেছিলেন— তাতে চাঁদির কাজ। পায়ে সুন্দর ফুলের কাজ করা সাদা স্লিপার আর তাঁর সুন্দর বাহুযুগল হীরক বলয়ে শোভিত ছিল; তাঁর কটিদেশে ছিল একটি হীরক খচিত কোমরবন্দ, মস্তকে একটী চাঁদির কাজ করা গোলাপী রংএর মহামূল্য তুর্কী রুমাল—তার ভিতর থেকে অতি মনোহর সুকৃষ্ণ অলকগুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল। মস্তকের এক পাশে কতকগুলি মহামূল্য মণি-মাণিক্যের বডকিন (একরকম পিন) লাগানো ছিল। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই বর্ণনা শুনে তুমি আমার উপর অতিরঞ্জনের দোষ আরোপ করবে। মনে হয় কোথাও পড়েছি, সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় স্ত্রীলোকের ভাবের উৎস উৎসারিত হয়ে পড়ে। এতে যে দোষের কি আছে, আমি তা বুঝতে পারি না। আমার বরং মনে হয় ঈর্ষা এবং লোভ অতিক্রম করে পরের প্রশংসা করা হচ্ছে মস্ত একটা সদ্‌গুণ। একান্ত সুধী এবং সংযত লোকও কোন বিখ্যাত চিত্র কিম্বা মূর্ত্তির প্রশংসা কীর্ত্তনে ভাবে গদ গদ হয়ে উঠেন। খোদার শিল্প নিদর্শন-গুলি নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষীণ অনুকরণের চেয়ে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর। আর

তাদের গুণ কীর্ত্তনও সেই অনুপাতে সমধিক প্রশংসনীয়। একথা স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করি না যে সৌন্দর্য্যের আধার সেই অতুলনীয়া হেরেমকে দেখে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখেও কখনও তা পাইনি।

যে বালিকা দু'টী পায়ের কাছে বসেছিল, হেরেম নিজের কন্যা বলে তাদের পরিচয় দিলেন। আমার কিন্তু মনে হল, তাদের গর্ভধারিণী হবার যোগ্য বয়স এখনো তাঁর হয়নি। তাঁর সুন্দরী সহচরীরা মসনদের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল—সংখ্যায় তারা বিশজন হবে। তাদের দেখে, প্রাচীন যুগের পরীদের যে সব ছবি দেখেছি, সে সবের কথা আমার মনে এলো। আমার তখন প্রতীতি জন্মালো যে, সমস্ত পৃথিবী ঘুরলেও সৌন্দর্য্যের এমন একটী মনোমুগ্ধকর ছবি আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না।

হেরেম তাঁর পরিচারিকাদের কিছু নৃত্য প্রদর্শন করতে আদেশ করলেন। চার-পাঁচজন সুন্দরী তখন সেতারের মত একরকম বাদ্য-যন্ত্রে মধুর সুরের আলাপ করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে গলা মিলেয়ে গাইতে লাগলো। আমি পূর্ব্বে যে সব নাচ দেখেছি, এ নাচ সে সব থেকে ভিন্ন রকমের। নৃত্যকলা এর চেয়ে ভাল যে কি হতে পারে, আমিতো তা কল্পনাও করতে পারি না, আর অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব বিশ্লেষণ তাদের মত আর কেউ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। নাচতে নাচতে এক একবার তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল আর এমন ভাবে চাইছিল যেন প্রাণের স্পন্দন তাদের একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, লুটিয়ে যেন তারা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে; পরক্ষণেই কিন্তু তারা এমন সুন্দর ভঙ্গীমায় উঠে দাঁড়াচ্ছিল যে, আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সবচেয়ে গম্ভীর এবং নীতিপাগল মানুষও তাদের দেখে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকতে পারতো না।

সম্ভবতঃ তুমি কোথাও না কোথাও পড়ে থাকবে, তুর্কীদের বাদ্য কলা শুনে

কাণ ঝালা-পালা না হয়ে থাকতে পারে না। এ রকম মন্তব্য যারা প্রকাশ করে, তারা কিন্তু সড়ক আর চৌরাস্তার বাদ্য ছাড়া আর কিছু শোনেনি। সেসব শুনে তুর্কীবাদ্যের সমালোচনা করা, কোন বিদেশীর পক্ষে, আমাদের রাস্তাঘাটের বাদ্য শুনে ইংরাজিবাদ্যের সমালোচনা করার মতই অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত। খুব জোরের সঙ্গেই আমি বলছি—এদের বাদ্যের সুর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। একথা অবশ্য আমি স্বীকার করি, ইটালিয়ান মিউজিকই আমার বেশী ভাল লাগে। তবে আমার বিশ্বাস সেটা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। আমার পরিচিত একটী গ্রীক মহিলা আছেন যিনি মিসেস্ রবিনসনের চেয়েও ভাল গাইতে পারেন। তিনি এই দু'রকমের মিউজিকেই সমান পারদর্শিনী; কিন্তু এই তুর্কি মিউজিকই তাঁর বেশী পছন্দ। একথাও নিশ্চিত সত্য যে, কোকিলের স্বাভাবিক স্বর অতি সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী।

নৃত্য শেষ হ'বার পর চারজন সুন্দরী পরিচারিকা চাঁদির পাত্রে কস্তুরী এলোকাষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য এনে প্রকোষ্ঠটীকে সুবাসিত করলে। তারপর তারা নতজানু হয়ে সুন্দর জাপানী পাত্রে আমার সামনে কফি উপস্থিত করলে।

সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেরেম এই সমস্ত সময়ই সৌজন্যপূর্ণ সদালাপে আমার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বারম্বার আমায় সুন্দরী সুলতানা বলে সম্বোধন করছিলেন। আমায় যে আমার ভাষাতেই কথা বলে আপ্যায়িত করতে পারছিলেন না, তার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

আমার যখন বিদায় নেবার সময় হল, দুইজন পরিচারিকা তখন একটী রৌপ্যনির্ম্মিত টুকরিতে কতকগুলি সুন্দর কাজকরা রুমাল এনে হাজির করলে। সব চেয়ে সুন্দর রুমালগুলি আমায় দিয়ে হেরেম বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধ করলেন, তাঁর কথা মনে করে আমি যেন সেই রুমালগুলি নিজে ব্যবহার করি। বাকি রুমালগুলি তিনি আমার সঙ্গিনীদের দান করলেন। বিদায়-কালীন অনুষ্ঠানাদির পর আমরা সেখান থেকে চলে এলুম।

যা দেখলুম তাতে আমার মন এতই মোহিত হয়েছিল যে, একথা না ভেবে থাকতে পারলুম না যে, ক্ষণেকের তরে আমি হজরত মোহাম্মদ (সঃ) বর্ণিত স্বর্গেই সময় কাটিয়ে এসেছি। আমার এই বর্ণনা তোমায় কেমন লাগবে বলতে পারি না। আশা করি, যে আনন্দ আমি পেয়েছি, সে আনন্দের একটু অংশও অন্ততঃ তুমি পাবে। আমার প্রিয় ভগিনীকে আমার সব আনন্দের অংশীদার করবার জন্য সর্ব্বদাই আমি ব্যগ্র!*

একটী গল্প

এমিলান্ ছিল একজন শ্রমিক। সারাদিন সে তার প্রভুর কাজ করত। একদিন সে মাঠ অতিক্রম করে' যাচ্ছিল। হঠাৎ প্রকাণ্ডকায় একটা ব্যাঙ তার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। সন্তর্পণে ব্যাঙটাকে না মাড়িয়ে এমিলান পথে অগ্রসর হচ্ছিল এমনি সময়ে হঠাৎ পেছন থেকে কার কণ্ঠস্বর তার কাণে এল।

পেছন ফিরে এমিলান দেখলে এক সুন্দরী তরুণী সহাস্য বদনে তার দিকে চেয়ে আছে! তরুণী বললে "এমিলান, তুমি বিয়ে করনা কেন?"

এমিলান উত্তর দিলে "বিয়ে আমি কি করতে পারি? গায়ের এই কাপড় ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কোন সম্বল নাই। কোন মেয়েই আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করবে না।"

[* Lady Montagu's Letters নামক ইংরাজী গ্রন্থের একটি পত্রের অনুবাদ।]

তরুণী বললে "কেন করবে না? আমি তোমার স্ত্রী হব।"

এর মধ্যেই এমিলান তরুণীকে ভালবেসে ফেলেছিল! সে বললে "তোমাকে স্ত্রীরূপে পেলে সত্যই আমি সুখী হ'ব; তবে আমরা থাকব কোথায়? আর কি করেই বা আমাদের চলবে?"

তরুণী বললে "কাজ একটু বেশী করলে আর একটু কম করে' শুলে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা যে কোন স্থানে হয়ে যেতে পারে।"

এমিলান আর তরুণী নিকটের সহরের প্রান্তে ছোট্ট একটা ঘর নিলে। তরুণীর পরামর্শমত এমিলান একটু বেশী করে' কাজ করতে লাগল, আর একটু কম করে' শুতে লাগল। সংসার তাদের ভালই চলতে লাগল।

দেশের রাজা একদিন তরুণ দম্পতীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমিলানের স্ত্রী রাজাকে দেখবার জন্যে কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়াল। রাজা তাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। গাড়ী থামিয়ে তরুণীকে ডেকে তিনি বললেন "কে তুমি?" তরুণী বললে "আমি কৃষক এমিলানের স্ত্রী।" রাজা বললেন, "তুমি এত সুন্দরী! এই চাষীকে কেন তুমি বিয়ে করতে গেলে? তোমার যে রাণী হওয়া উচিত ছিল।" তরুণী বললে "চাষা স্বামী নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। আর কাউকে আমি চাই না।"

প্রাসাদে ফিরেও কিন্তু এলিমানের স্ত্রীর কথা রাজা ভুলতে পারলেন না। সকালে তিনি কর্ম্মচারীদের ডেকে পাঠালেন আর এমিলানের স্ত্রীকে হস্তগত করবার কোন না কোন একটা উপায় বার করতে তাদের কড়া হুকুম দিলেন।

কর্ম্মচারীরা বললে "এ নিয়ে আর ভাবনা করবার কি আছে? এমিলানকে প্রাসাদে এসে কাজ করতে আদেশ করুন। আমরা তাকে এমন খাটাব যে, দু'দিনেই সে অক্কা পাবে! আপনি অবাধে তখন তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবেন।"

কর্ম্মচারীদের পরামর্শমত এমিলানকে রাজবাড়িতে কাজ দেওয়া হ'ল।

একাগ্র মনে সারা দিন সে তার কাজ করলে। সন্ধ্যা হ'ল, কাজও শেষ হ'ল। দ্বিতীয় দিন সকাল হতেই সে কাজে গেল। চার জন যোয়ানের কাজ তাকে দেওয়া হ'ল। কোন দিকে না তাকিয়ে সারাদিন সে কাজ করতে লাগল। সন্ধ্যা এল, তার কাজও শেষ হ'ল। রাত্র হবার পূর্ব্বেই সে বাড়ী ফিরে গেল।

রোজই রাজার লোকেরা এমিলানকে বেশী করে কাজ দেয়। আর রোজই বরাদ্দ কাজ শেষ করে' সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বাড়ী ফিরে যায়। এই ভাবে এক সপ্তাহকাল কেটে গেল। রাজার লোকেরা দেখলে খাটিয়ে লোকটাকে মারতে পারা যাবে না। পরামর্শ করে' তারা স্থির করলে, এবার থেকে এমিলানকে এমন সব কাজ দেবে, যাতে কেবল খাটলে চলবে না, নিপুণতাও দেখাতে হবে। তা' করেও কিন্তু এমিলানকে তারা হারাতে পারলে না। ছুঁতোরের কাজ, কামারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ঘরামির কাজ, যে কাজই তাকে তারা করতে দেয়, সেই কাজই সুচারুভাবে সে করে' ফেলে। আর সন্ধ্যা হতে না হতেই দিনের কাজ শেষ করে' স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহ এই ভাবেই কাটল।

রাজা বিরক্ত হয়ে কর্ম্মচারীদের ডেকে র্ভৎসনা করলেন। নূতন কোন কাজ বার করতে বিশেষ করে' তাদের বললেন—যে কাজ এমিলান কোন মতেই সম্পন্ন করতে পারবে না। কর্ম্মচারীরা ভেবে চিন্তে বললে "এমিলানকে ডেকে একদিনের মধ্যে একটা গির্জ্জা তৈয়ের করতে বলুন। নিশ্চয় সে হার মানবে। তখন শাস্তিস্বরূপ আপনি তার প্রাণ দণ্ড দিতে পারবেন, আর তার স্ত্রী অবাধে আপনার হয়ে যাবে।"

রাজা এমিলানকে ডেকে প্রাসাদের সামনে বড় একটা গির্জ্জা তৈয়ের করতে আদেশ করলেন। সে যদি তা' না করতে পারে, তা' হ'লে তার প্রাণদণ্ড হ'বে, একথাও তাকে বলে' দেওয়া হ'ল।

বিষণ্ণ মনে এমিলান বাড়ী ফিরে গেল আর স্ত্রীর পরামর্শ চাইলে। স্ত্রী

বললে "নিশ্চিন্ত মনে আহার শেষ করে' ঘুমিয়ে পড়। সকাল সকাল উঠে কাজে যেয়ো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এমিলান স্ত্রীর কথামত আহার শেষ করে' ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রত্যুষে স্ত্রী এমিলানের ঘুম ভাঙিয়ে বললে "যাও, এখখুনি কাজে যাও। গির্জ্জাটা শেষ করে' ফেল। বাড়ীতে পেরেক আর হাতুড়ি আছে। ওগুলো নিয়ে যাও। এক দিনের মত কাজ এখনও বাকি আছে। এখখুনি যাও তুমি।"

সকালে প্রাসাদের জানালায় দাঁড়িয়ে রাজা দেখলেন—সামনের পড়ো জমীর উপর সদ্যনির্ম্মিত প্রকান্ড একটা গির্জ্জা দাড়িয়ে আছে। গির্জ্জার কিছু কিছু কাজ এখনও অবশিষ্ট আছে, আর এমিলান একাগ্র মনে সেই কাজ ক'রে যাচ্ছে। রাজা ভয়ানক বিরক্ত হলেন। এমিলানকে শাস্তি দেওয়া হ'ল না!

কর্ম্মচারীদের ডেকে নূতন কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করতে তিনি তাদের আদেশ করলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কর্ম্মচারীরা বল্লে "এমিলানকে এবার প্রাসাদের পাশে একটা নদী খুঁড়তে হুকুম দিন। সেই নদীতে জাহাজও থাকা চাই। নিশ্চয় সে তা'হলে হার মানবে।" কর্ম্মচারীদের পরামর্শমত এমিলানকে ডেকে রাজা বললেন "কাল প্রাসাদের পাশে তোমাকে একটা নদী চালাতে হবে। সে নদীতে জাহাজও থাকা চাই। যদি না করতে পার অবাধ্যতার জন্য তোমার প্রাণদণ্ড হবে।"

এমিলান স্ত্রীর কাছে গিয়া পরামর্শ চাইল! স্ত্রী বললে "ভাবনা করবার কিছু নাই! নিশ্চিন্ত মনে আহার কর, তারপর ভাল ক'রে ঘুমোও। সকাল সকাল উঠো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্ত্রীর কথামত এমিলান খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হইতেই স্ত্রী তাকে উঠিয়ে বললে "যাও, প্রাসাদে যাও। সব তৈয়ের আছে, কেবল মাটীর

একটা ঢিবি পড়ে' আছে। বাড়ী থেকে কোদাল নিয়ে যাও। ঢিবিটাকে সমান করে' দিও।"

রাজা সকালে উঠে দেখলেন, প্রাসাদের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর উপর জাহাজের চলাচল হচ্ছে। আর এমিলান তীরে কোদাল দিয়ে একটা ঢিবিকে কেটে সমান করছে

রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন। নদী তাঁর ভাল লাগল না, আর জাহাজও ভাল লাগল না। এমিলানকে যে তিনি শাস্তি দিতে পারলেন না, এই চিন্তাই তাঁকে অধীর করে তুল্‌লে।

রাজা আবার কর্ম্মচারীদের মন্ত্রণা চাহিলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তারা বললে "এবার যে মতলব এঁটেছি, সেটা আর ব্যর্থ হবে না। এমিলানকে ডেকে বলুন "সেখানে যাও, কোথায় ঠিক জানি না; আর সেই জিনিষটা আন, কোন জিনিষ ঠিক তা' জানি না। একাজে নিশ্চয় সে হার মানবে। যেখানেই সে যাক না কেন, আপনি বল্‌তে পারবেন, ঠিক জায়গায় তোমার যাওয়া হয়নি। আর যে জিনিষই আনুক না কেন, আপনি বলতে পারবেন, ঠিক জিনিষ তোমার আনা হয়নি। এই বলে' আপনি তার প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন। তার স্ত্রী আপনার হয়ে যাবে।"

রাজা খুসী হয়ে বললেন "এবার তোমরা সত্যই ভাল পরামর্শ দিয়েছ।" তিনি অবিলম্বে এমিলানকে ডেকে পাঠালেন আর এই নূতন আদেশ তাকে শুনালেন; আর বললেন, "একাজ যদি না করতে পার, তা'হলে তোমার প্রাণদণ্ড হ'বে।"

এমিলান বাড়ী ফিরে রাজার আদেশ স্ত্রীকে শুনাল। স্ত্রী এবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। এমিলানকে সম্বোধন করে' সে বললে, "তোমাকে ধরবার ফাঁদ সত্যই এবার তারা পেতেছে। আমাদের এখন খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করে' এমিলানের স্ত্রী বললে "অনেক দূর তোমায় যেতে হ'বে! দিদিমার কাছে তোমায় পাঠাব। তিনি একজন কৃষকগৃহিণী। তাঁর অনেক ছেলে ফৌজে সেপাইয়ের কাজ করে। তাঁর পরামর্শমত কাজ করবে, আমি তারপর সোজা প্রাসাদে যাব। সেখানেই আমাকে দেখ্‌তে পাবে। রাজার লোকদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আপততঃ আমার কোন উপায় নাই। তবে দিদিমার কথামত যদি কাজ কর, তা'হলে শীঘ্রই আমাকে মুক্ত করতে পারবে।"

এমিলানের জিনিষপত্র গুছিয়ে একটা ব্যাগের মধ্যে রেখে, তার হাতে একটা মাকু দিয়ে, এমিলানের স্ত্রী বলল "এই মাকুটা দিদিমাকে দিলেই তিনি বুঝবেন, তুমি আমার স্বামী।" তারপর সে এমিলানকে দিদিমার বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিলে।

পথ চল্‌তে চল্‌তে এমিলান এক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হ'ল। সৈনিকেরা সেখানে কুচকাওয়াজ করছিল। এমিলান দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল। কুচকাওয়াজ শেষ হবার পর সৈনিকেরা এদিক্ ওদিক্ বসে' বিশ্রাম নিতে লাগল। খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে' এমিলান আবার পথ চল্‌তে সুরু করল। শেষে সে একটা জঙ্গলে এসে উপস্থিত হ'ল। জঙ্গলে একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। সেখানে বসে এক বৃদ্ধা সূতো কাট্‌ছিলেন আর চোখের জল ফেল্‌ছিলেন! তিনিই হলেন সৈনিকদের মাতা আর এমিলানের স্ত্রীর দিদিমা।

বৃদ্ধাকে অভিবাদন করে' এমিলান তাঁর হাতে স্ত্রীর দেওয়া মাকুটা দিলে! বৃদ্ধা এমিলানকে সাদরে বসালেন আর তার সঙ্গে আলাপ করলেন।

জীবনের সব কথাই এমিলান তাঁকে বললে, তার স্ত্রীর কথা, তার কাজের কথা, রাজা যে সব ভয়াবহ কাজের ভার তার উপর দিয়েছিলেন সে সবের কথা, আর সর্বোপরি যে দায়িত্ব সর্ব্বশেষে তার উপর ন্যস্ত হয়েছে, সেই দায়িত্বের কথা।

গম্ভীর মুখে বৃদ্ধা সব শুনলেন। চোখের জল মুছে স্বগতঃভাবে তিনি বললেন "সময় এখন নিশ্চয় এসেছে।" এমিলানকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন "তুমি বাবা, অনেক হেঁটেছ। একটু বিশ্রাম কর। আমি তোমার খাবার আয়োজন করছি।"

আহারের পর বৃদ্ধা বললেন "শোন বাছা! এই সূতোর গুলিটা তোমায় দিচ্ছি। এটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। এটা গড়িয়ে যাবে আর তুমি এর অনুসরণ করবে। যেতে যেতে তুমি সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হবে। সেখানে বড় একটা সহর আছে। সহরের প্রান্তে যে বাড়ীটা আছে, সেখানে তুমি রাত্রের জন্য আশ্রয় চাইবে। অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান সেখানেই তুমি পাবে।

এমিলান—"জিনিষটাকে দেখলে কি করে' চিনতে পারব দিদিমা?"

বৃদ্ধা বললেন "যখন এমন একটা জিনিষ দেখতে পাবে, যার আদেশ মানুষ বাপ-মায়ের আদেশের চেয়েও বেশী মান্য করে, তখন বুঝবে তোমার সন্ধানের বস্তু তুমি পেয়েছ! সেই জিনিষটা তুমি রাজার কাছে নিয়ে যাবে। রাজা বলবেন "এ সে জিনিষ নয়, যার জন্য তোমায় পাঠিয়েছিলুম।" তুমি তখন বলবে "এ যদি সে জিনিষ না হয়, তা' হলে এটাকে রাস্তায় নিয়ে আমি ভাঙ্গব।" তারপর জিনিষটার উপর আঘাত করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্বে। আর দেশের সমস্ত লোকের সামনে টুকরো টুকরো করে সেটাকে ভাঙ্গবে—টুকরোগুলোকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। দেখবে তোমার স্ত্রীকে তখন তুমি ফিরে পাবে। আর আমার চোখের অশ্রুও তখন শুকিয়ে যাবে।"

বৃদ্ধাকে অভিবাদন ক'রে এমিলান বের হ'ল, আর সেই সূতোর গুলিটাকে রাস্তায় ফেলে দিলে। গুলিটা রাস্তায় গড়াতে লাগল। এমিলান তার অনুসরণ করে চলল। গুলিটা শেষে সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌছুল। সেখানে বড় একটা সহর ছিল, আর সহর প্রান্তে ছিল একটা বাড়ী। সেই বাড়ীতে এমিলান রাত্রের জন্য আশ্রয় নিলে। সকালে উঠে এমিলান দেখলে বাড়ীর

ছেলের বাপ তাকে উঠিয়ে বলছে "যাও জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আন।" ছেলে কিন্তু বাপের কথা শুনলে না। সে বললে "এখনও সকাল হয়নি, অনেক সময় আছে।" পাশ ফিরে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলের মা তখন ছেলেকে সম্বোধন ক'রে বলল "যাও বাবা, যাও, দেখছ না তোমার বাবা পায়ের ব্যথায় পড়ে' আছেন। তুমি যদি না যাও, তা' হলে তাকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে হ'বে। সূর্য্য উঠেছে, তোমার ওঠবার সময় হয়েছে।"

পুত্র বিড় বিড় করে কিছু বকে' আবার পাশ ফিরে শুল। হঠাৎ রাজপথে ভীষণ শব্দ শোনা গেল। ছেলেটা এক লাফে বিছানা থেকে উঠে', তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে' রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এমিলানও তার পেছনে পেছনে ছুটল—ছেলেটা মা-বাপের আদেশের চেয়ে কার আদেশ বেশী মান্য করে, দেখবার উদ্দেশ্যে।

রাস্তায় গিয়ে এমিলান দেখলে, একজন লোক বড় একটা জিনিষ বুকে নিয়ে সেটাকে বাজিয়ে বাজিয়ে চলেছে, আর সহস্র সহস্র মানুষ তার অনুসরণ ক'রে তার বাদ্যের তালে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে চীৎকার করতে করতে চলেছে। এমিলান দৌড়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে "জিনিসটাকে কি বলে গা?" লোকটা বলল "জিনিষটা দেখতে ঠিক একটা ঢোলের মত, তবে কি জিনিষ যে ওটা ঠিক আমি জানি না।" এমিলান—পুনরায় প্রশ্ন করলে "জিনিষটার ভেতর কি আছে?"

লোকটা বললে "ওর ভেতর আছে ক্ষুধার জ্বালা, দুঃখের যন্ত্রণা, আরও কত কিছু!"

এমিলান জনতার সঙ্গে চলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ঢুলি ঢোলটা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে এমিলান সেটাকে তুলে নিয়ে দৌড়ুতে লাগল।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে এমিলান শেষে তার দেশে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাড়ী গিয়ে দেখল—তার স্ত্রী সেখানে নাই। রাজার লোকেরা তাকে প্রাসাদে

ধ'রে নিয়ে গেছে। সোজা প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে সম্বোধন করে' এমিলান বলল "আমি সেই দেশে গিয়েছিলুম, কোথায় ঠিক জানি না। আর সেই জিনিষ নিয়ে এসেছি, কি জিনিষ ঠিক জানি না।"

রাজা বললেন "ঠিক জায়গায় তোমার যাওয়া হয়নি, আর ঠিক জিনিষ তুমি আনতে পারনি।"

এমিলান—"তাই নাকি? আচ্ছা, রাস্তায় নিয়ে এটাকে তা হ'লে আমি ভাঙছি।" ঢোল বাজাতে বাজাতে এমিলান রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দেশের যত লোক, রাজার যত সেপাই, নিজ নিজ কাজকর্ম্ম ছেড়ে, সকলেই এমিলানের অনুসরণ করতে লাগল, আর তার ঢোলের তালে নাচতে লাগল, গাইতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল!

রাজা জানালায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। সৈনিকদের তিনি তাঁর কাছে ফিরে আসতে বললেন। কেউ ফিরে এল না। জনতাকে এমিলানের অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। কেউ তাঁর কথায় কান দিলে না। সকলেই বলল "এমিলান যা' বলবে তাই আমরা করব; এমিলান যেথায় নিয়ে যাবে সেখানেই আমরা যাব।"

রাজা এমিলানকে বললেন "তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ঢোলটা আমায় দাও।" এমিলান বলল "ঢোল দেওয়া হ'বে না। আমি রাস্তায় ওটাকে ভাঙব। আমার উপর আদেশ আছে, ঢোলটাকে ভেঙে ওর টুকরো-গুলোকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।" লোকজনদের ডেকে ঘটা ক'রে এমিলান ঢোলটাকে রাস্তায় ভাঙল আর তার টুকরোগুলোকে এদিক্ ওদিক্ ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একটা টুকরো সজোরে রাজার মাথায় গিয়ে পড়ল; রাজার মাথার খুলিটা ভেঙে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। এমিলানের স্ত্রী তার কাছে ফিরে এল। রাজ্যের আকার-প্রকার সমস্ত গেল বদলে।*

* বৈদেশিক গল্পের ছায়া অবলম্বনে:—All India radio-র সৌজন্যে।

জীবনে শিল্পের স্থান

জীবনকে সুন্দর করতে হলে সৌন্দর্য্যের নিদর্শন শিল্পকে সাধারণ জীবনে বিশিষ্ট একটা স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের বাড়ী সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ীর প্রাঙ্গণ সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ীর আসবাব পত্র সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ীর বেষ্টনীও সুন্দর হওয়া চাই। তারপর আমরা যা পরি, আমরা যা ব্যবহার করি, সবই সুন্দর হওয়া চাই। কেবল তাই নয়—আমাদের বস্‌বার ভঙ্গী সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের উঠ্‌বার ভঙ্গী সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের কথা বলবার ভঙ্গী সুন্দর হওয়া চাই, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ, আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী আমাদের প্রত্যেকটি আচার, প্রত্যেকটি ব্যবহার সুন্দর হওয়া চাই। যা অসুন্দর, যা কদর্য্য, যা কুৎসিৎ যা কদাকার সে সবকে কোন-না-কোন উপায়ে জীবন থেকে আমাদের তাড়াতে হবে। সত্য যেমন বাঞ্ছনীয় জীবনের অপরিহার্য্য একটি অঙ্গ, শ্রেয় যেমন বাঞ্ছনীয় জীবনের অপরিহার্য্য একটি অঙ্গ, সুন্দরও তেমনি সেই বাঞ্ছনীয় জীবনেরই অপরিহার্য্য একটি অঙ্গ। প্রাচীন গ্রীকেরা যে একান্ত ভাবে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন পাঠক সে কথা জানেন। তাঁরা যুদ্ধকুশল এবং যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন। তাদের বিষয় আমি পড়েছি, যুদ্ধের সময় সর্ব্বাঙ্গ তাঁরা লাল কাপড়ে আবৃত করে তাঁরা যুদ্ধে যেতেন,—রক্তের দাগ দেহকে তাঁদের যাতে কুৎসিৎ, কদাকার করে না তোলে সেই উদ্দেশ্যে। আমাদেরও তাঁদেরই মত জীবনকে সর্ব্বপ্রকার কদর্য্যতা থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

বাঙলা দেশের গ্রামে এবং সহরে কি দৃশ্য আমরা দেখতে পাই? আমার নিজের এবং আশপাশের গ্রামগুলির কথাই এখন বলি। মোটরযোগে কিংবা

পদব্রজে District Boardএর রাস্তা বেয়ে যখন গ্রামের দিকে অগ্রসর হই, তখন স্পষ্টই মনে হয়, District Boardএর কর্ত্তারা জীবনে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা মোটেই উপলব্ধি করেন না। সরু, অসমান পথ, দুধারে তার আগাছার রাশ। পথের পাশ দিয়ে চলে গেছে নর্দ্দমা, তাতে কতরকম আবর্জ্জনা যে পড়ে আছে তা বর্ণনা করা যায় না। অদূরে বাঁশের বন, তাতে মানুষও প্রবেশ করতে পারে না, আর আলোকও প্রবেশ করতে পারে না। ডোবা, পুষ্করিণী, মজানদী সবই লতাগুল্মে ভরা—কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াসের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা দেশ নিয়ে গর্ব্ব করতে ভালবাসি। বক্ষ স্ফীত করে সময়ে অসময়ে আমরা বলে থাকি বাঙলা দেশের মত সুন্দর দেশ কোথাও নাই। কিন্তু সত্যই কি তাই!

এই সেদিন আমি শিমুলতলায় গিয়েছিলুম। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমার সঙ্গে এক তরুণ বন্ধু ছিলেন। বাঙলা দেশকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। শিমুলতলায় যাবার পূর্ব্বে তাঁর কাছে বাঙলা দেশের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা অহঃরহ শুনতে পেতুম। ফেরবার সময় যখন আমাদের ট্রেণ বাঙলার মাটীতে প্রবেশ করলে তখন দেখলুম আমার তরুণ বন্ধু মাতৃভূমির সৌন্দর্য্যের বিষয় তাঁর মত সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলেছেন। সত্যই, বর্দ্ধমান থেকে কলকাতায় আসতে যে কদর্য্যতা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যথায় জর্জ্জরিত করে, তা দেখে মনে হয় না যে আমাদের দেশের লোকেরা জীবনে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র উপলব্ধি করছেন।

আমার গ্রামের কথায় ফেরা যাক্। District Boardএর রাস্তা থেকে যে পথ গ্রামে গিয়েছে সে পথ এত সরু যে তার উপর দিয়ে কোন রকম যানবাহন চালান একান্ত কঠিন ব্যাপার। সেই সরু রাস্তাকে গ্রামবাসীদের সৌন্দর্য্যানুভূতিহীন স্বার্থপরতা নিত্যই আরও সরু করে তুলছে। সকলেই সাধারণের রাস্তার এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি কিংবা ততোধিক পরিমাণ জমি নিজের

এলাকাভুক্ত করবার জন্য ব্যগ্র। রাস্তার সৌন্দর্য্যের দিকে কারও দৃষ্টি নাই, সৌন্দর্য্য নামক জিনিসটার দিকেই কারও দৃষ্টি নাই। গ্রামে অনেকগুলি কোঠাবাড়ী আছে। সে সব প্রস্তুত করতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির কোন নিদর্শন বাড়ীগুলির ভিতরেও পাওয়া যায় না আর বাইরেও পাওয়া যায় না। এক কাঠা জমিও কেউ সুন্দরভাবে সাজাতে চেষ্টা করেনি। কেউ হয়তো কিছু ফার্নিচার, দু' একখানা ছবি একটা ঘরে রেখেছে। কিন্তু সে ঘরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, যে গৃহস্বামী Taste বা রুচি জিনিসটার সঙ্গে দূর সম্পর্কও রাখে না। মাটীর বাড়ীর অবস্থা কোঠাবাড়ীর চেয়েও শোচনীয়, আর বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতির বিষয় কিছু না বলাই ভাল।

পল্লীগ্রামের বিষয় যা বলা হল, সহরের বেলাতেও তাই বলা চলে। বেশী লিখে আমি প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে চাই না! সহরের ঘর বাড়ী আসবাব-পত্র, বাড়ীর বেষ্টনী প্রভৃতি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আমাদের দেশবাসীরা জীবনে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন মোটেই অনুভব করেন না, সুন্দর কি আর অসুন্দর কি সে বিষয় তাঁদের ধারণা একান্তই কুহেলিকাবৃত।

আমি একস্থানে বলেছি, পুনরায় বলি, সব চেয়ে বড় শিল্প হচ্ছে জীবন-শিল্প। অন্য সব রকমের শিল্প হচ্ছে সেই বিরাট্ জীবন শিল্পেরই এক একটি বিভাগমাত্র। প্রত্যেকটি বিভাগের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার জীবন-শিল্পকে সার্থক করার জন্যে। আর তা যদি সত্যই করতে চাই তাহলে এই আদর্শকে সম্মুখে রেখে আমাদের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, আমাদের কাজকর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, আমাদের নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, এক কথায় আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আর তার জন্য দরকার ব্যাপক এবং ঐকান্তিক সামবায়িক প্রচেষ্টায়।

পাঠক বলবেন, "এত বড় প্রচেষ্টার কথা বলা সহজ, করা সহজ নয়। ক্ষুদ্র আমি এতে কি করতে পারি?"

তবে বলি শুনুন। আপনি এতে অনেক কিছু করতে পারেন। আপনার বাড়ীকে সুন্দর করে সাজান। আপনার বাড়ীর উঠানকে, আস-পাশের জমিকে পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত করে তুলুন। আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ আর্টের এক একটি নিদর্শন হোক্। সুন্দর এক বেষ্টনী আপনার জীবনে ঘিরে থাকুক। সুন্দরের প্রশংসায় আপনার কণ্ঠ মুখরিত হোক্! দেখবেন নিজেকে যতটা ক্ষুদ্র মনে করেছিলেন ততটা ক্ষুদ্র আপনি নন। আর দেখবেন, আপনার স্তব-স্তুতিতে, আপনার সাধনায় তুষ্ট হয়ে সৌন্দর্য্য দেবী আপনার গ্রামে, আপনার পাড়ায় সশরীরে আবির্ভূতা হয়েছেন।

মুক্ত মানব

অনেক দিন পূর্ব্বে Goldsmith-এর The Citizen of the World গ্রন্থে একটা হাস্যকর ঘটনার কথা পড়েছিলুম। বিলাতে কয়েক জন জেলের কয়েদী স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করছিল। তাদের দেশ নিয়ে তারা গর্ব্ব করছিল, ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য রাজ্যের নিন্দাবাদ করছিল। তারা বলছিল যে ইংলণ্ডের প্রত্যেকটা মানুষই স্বাধীন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী, আর continent-এর প্রত্যেক মানুষই পরাধীন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবর্জ্জিত। আলোচকেরা যে বন্দী এবং পরাধীন, একথা,

তর্কের উৎসাহে তারা ভুলে গিয়েছিল, অথবা এই সত্যটা তাদের মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি

আজকাল স্বাধীনতার বুলি সকলেরই মুখে। আমরা স্বাধীন হতে চাই, ইংরাজ আমাদের অধীন করে রেখেছে। বিশ্ববাসী স্বাধীন থাকতে চায়, এবং পরস্পরের স্বাধীনতার সম্মান করতে চায়। দুর্দ্দান্ত হিট্‌লার তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাবার চেষ্টা করছে। এসিয়াবাসী স্বাধীন হতে চায়, ইংরাজ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা তাদের বাধা দিচ্ছে, এসিয়া-প্রেমিক জাপান তাই এসিয়াবাসীর মুক্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। এই ধরণের কত কথা সাধারণ মানুষ অনর্গল বকে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীনতার মানে কি, কেউ কি তা ভেবে দেখেছে? কতটা স্বাধীনতা আমাদের আছে, আর কতটা নাই, তা-ও কি কেউ ভেবে দেখেছে? প্রস্তাবিত কোন্ পরিবর্ত্তনে কতটা স্বাধীনতা আমাদের হস্তগত হবে, আর কতটা হবে না, তা-ও কি কেউ ভেবে দেখেছে? আর এই সর্ব্বজনকাম্য স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় আমাদের তথাকথিত শত্রুরা, না আমরা নিজেরা, তা-ও কি কেউ ভেবে দেখেছে?

যত বয়স যায়, ততই এ সত্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সাধারণ মানুষ সবদেশেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত দাসের জীবনই যাপন করে। প্রকৃত মুক্তি অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। আর প্রকৃত মুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা তথাকথিত কোন পরাধীন দেশের চেয়ে তথাকথিত কোন স্বাধীন দেশে বেশী না-ও হতে পারে, আর প্রকৃত দাসের সংখ্যা কোন স্বাধীনদেশে কোন পরাধীন দেশের চেয়ে কম না-ও হতে পারে। বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

সাধারণ মানুষ ইতিহাসের কোন ঘটনাকে সত্য, কোন ঘটনাকে মিথ্যা বলে মনে করে? সে যে সব ইতিহাসের বই পড়বার সুযোগ পায়, সে সবেতে যে ঘটনাকে সত্য বলা হয়েছে তাকেই সে সত্য বলে মনে করে, আর যে

ঘটনাকে মিথ্যা বলা হয়েছে তাকেই সে মিথ্যা বলে মনে করে ; যে যোদ্ধা বা রাষ্ট্রনেতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের সে প্রশংসনীয় বলে মনে করে, আর যাদের নিন্দা করা হয়েছে, তাদের সে নিন্দনীয় বলে মনে করে। ইতিহাসের বিষয় যা বলা হল সাহিত্য এবং ধর্ম্মের বিষয় তাই বলা চলে। সাধারণ মানুষকে যা শেখান যায়, তাই সে শেখে, আর যা বোঝান যায়, তাই সে বোঝে। মানুষকে যাঁরা ইচ্ছামাফিক চালাতে চান, propagandaর দিকে তাই তাঁদের এত ঝোঁক।

অনভ্যস্তের প্রতি, অপরিচিতের প্রতি, পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে যাদের ঝগড়া ছিল তাদের প্রতি, এখন যাদের সঙ্গে ঝগড়া আছে তাদের প্রতি, এবং ভবিষ্যতে যাদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়া সম্ভব তাদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব মানুষ-মাত্রেই একটু না একটু পোষণ করে থাকে, আর প্রাণিতত্ত্বের (Biology) দিক থেকে সে বিদ্বেষ বোধ হয় জাতিকে আত্মরক্ষায় অনেকটা সাহায্য করে। যাঁরা সমাজের উপর আধিপত্য করতে চান, মানুষের উপর আধিপত্য করতে চান, তাঁরা এই বিদ্বেষের আগুনে নিত্য নূতন ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তাকে মুক্ত মানবের স্বাধীন, সুচিন্তিত মনোভাব বলে কোন মতেই স্বীকার করা যায় না।

তারপর সাধারণ মানুষ, তার মনে ভগবানের যে প্রতিনিধিটী আছেন, তাঁর নির্দ্দেশ মতই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, একথা বললে অতিশয়োক্তি করা হবে। তা যদি হতো, তা হলে পৃথিবীতে এতগুলো প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রতন্ত্র দেখতে পাওয়া যেত না ; এত ফৌজ, লস্কর, ট্যাঙ্ক, বিমান, জাহাজ, কেল্লা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যেত না ; এত আইন, আদালত, উকিল মোক্তার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যেত না ; এত পুলিস, গোয়েন্দা, জেল অন্তরীণখানা প্রভৃতিও দেখতে পাওয়া যেত না। সাধারণ মানুষ চলে রিপুর নির্দ্দেশ মত। রিপু তো একটী নয়, রিপু আছে অনেকগুলি, কারও

কাম নামক রিপুটী প্রবল, কারও ক্রোধ নামক রিপুটী প্রবল। কারও লোভ নামক রিপুটী প্রবল, কারও মাৎসর্য্য নামক রিপুটী প্রবল। এই রকম বিভিন্ন রিপু মানুষের উপর আধিপত্য করে আসছে। মানুষ হল একটা ঘোড়ার মত, আর যে রিপুর আধিপত্য সে স্বীকার করে সে হল একটা ঘোড়সওয়ারের মত। সাধারণ মানুষ হল এই ঘোড়সওয়ারেরই দাস। ঘোড়সওয়ার যেদিকে লাগাম টানে, ঘোড়াকে সেইদিকেই যেতে হয়, তার গত্যন্তর নাই।

এই যে মানুষ নামধারী রিপুর বাহন, তাকে কি শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে মুক্ত করা যায়? শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন কি প্রাকৃতিক শৃঙ্খল থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে? পাঠক ভুল বুঝবেন না। আমি একথা বলছি না যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন কিংবা মূল্য নাই। আমার আলোচনার বিষয় তা নয়। মানুষের প্রকৃত মুক্তির পথ কি, সেই হল আমার আলোচনার বিষয়। সেদিক থেকে দেখলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে মুক্তি আনা যেতে পারে না। আমাদের পরাধীন দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিন। আমেরিকা তার স্বাধীনতা নিয়ে আজ গর্ব্ব করে থাকে, কিন্তু আমেরিকার একজন নাগরিক কি রিপুর দাসত্ব থেকে আমাদের চেয়ে বেশী মুক্ত? সেকি propagandaর দাসত্ব থেকে আমাদের চেয়ে বেশী মুক্ত? সেকি ধর্ম্মবিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, শ্রেণি-বিদ্বেষ প্রভৃতি অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় মনোবৃত্তির দাসত্ব থেকে আমাদের চেয়ে বেশী মুক্ত? আমেরিকার একান্ত ভক্ত-প্রশংসকও সে কথা বলতে সাহস করবে না। তাই যদি হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, যে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক আকার-প্রকার, বাহ্যিক সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন মানুষের জন্য প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে না।

প্রকৃত মুক্তি তা হলে কি করে পাওয়া যেতে পারে?

আমার মনে হয়, প্রকৃত মুক্তির একটী মাত্র সরল পথ আছে, যে পথ বিশ্বের

মহাপুরুষেরা মানব সন্তানকে চিরকাল দেখিয়ে এসেছেন যথা, নশ্বরকে ছেড়ে অবিনশ্বরে আত্মসমর্পণ, ক্ষণিককে ছেড়ে চিরন্তনে আত্মসমর্পণ, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছেড়ে ভূমায় আত্মসমর্পণ. আর অর্থনৈতিক স্বার্থ ছেড়ে আধ্যাত্মিক পরমার্থে আত্মসমর্পণ। এ ছাড়া প্রকৃত মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই।

তবে একথাও বলে রাখি, যারা চলতে শিখেছে, তাদের জন্য এপথ সরল বটে, কিন্তু সহজ মোটেই নয়। দস্যু, তস্কর, দৈত্যদানব, জীন, ভূত, প্রেত, পরী, কিন্নরী প্রভৃতিতে এপথ ভরে আছে; আর পথিকের যথাসর্ব্বস্ব হরণের জন্য তারা ওৎ পেতে বসে আছে। একবার তাদের কবলে পড়লে মুক্তির উদার রাজ্যে পৌছান পথিকের পক্ষে সত্যই কঠিন হয়ে পড়ে। পথিক যদি তার আদর্শের, তার মুক্তিকামনার জলন্ত এক প্রবাহ তার অন্তর থেকে বার করতে পারে, আর সেই প্রবাহের উদ্দাম ফেনিল উচ্ছ্বাস যদি পথের সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্নকে জালিয়ে পুড়িয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা হলেই সে মুক্তির আনন্দময় রাজ্যে পৌছুতে পারবে, অন্যথায় দাসের জীবনই তাকে যাপন করতে হবে, পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রীয় বিধান যাই হোক না কেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এক উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুর বাড়ীতে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প-সল্প করছিলুম। জীবনের নানান্ সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ কি, আর প্রাচ্য সভ্যতারই বা মুল কোথায়, এসব নিয়ে একটু কথার কাটাকাটিও চল্‌ছিল।

পাশের ঘরে একটি ইউরোপীয় পরিবার থাকৃতেন। হঠাৎ সেখান থেকে পিয়ানোর একটা ওয়ালটজের (waltz) সুর বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নাচের তালবদ্ধ পাদক্ষেপ আর আনন্দের উচ্ছ্বসিত কলহাস্য শুনতে পেলুম। বাদ্য এবং নৃত্য শেষ হলো। নর্ত্তনকারী যুবক-যুবতীদের আনন্দ কোলাহলে বাড়ীটা মুখরিত হয়ে উঠলো।

হঠাৎ একজন পিয়ানোতে Ragtimeএর উন্মত্ত ঝঙ্কার তুল্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রাণ খুলে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে লাগ্‌লো—"I love a lassie, a bonny bonny lassie. For, she is the sweetest girl, you know!" তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগলো। বাদ্যের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হ'তে লাগলো। আমার পায়ের আঙ্গুলগুলোও সেই বাদ্যের তালে তালে আপনা থেকেই নেচে উঠতে লাগলো। সমাজতত্ত্বের আলোচনা আপনা থেকেই থেমে গেল। চুপ করে আমরা আনন্দের সেই উচ্ছ্বসিত কলরোল শুনতে লাগ্‌লুম।

সাহেবদের বাড়ীর পাশেই ছিল একটা পুরান মস্‌জিদ। তার প্রাঙ্গণ থেকে সেই আনন্দ কলরব ভেদ করে (মোয়াজ্জিনের) নমাজের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সজোরে ডেকে উঠ্‌লো "আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর।"

তখনও মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সহরে খুনোখুনি চল্‌ছিল। আমাদের প্রতিবেশী ইউরোপীয়ানদের অবশ্য এই হট্টগোলে লিপ্ত হবার কোন কারণ ছিল না। আজান শুনেই তারা তাদের আনন্দ-কলরব বন্ধ করে দিলে। নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আজানের সেই মহাবাণী তখন আকাশে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! "আশ হাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" ইত্যাদি। (আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই)। আমরা স্তব্ধ হ'য়ে ধর্ম্মের এই উদাত্ত আহ্বান শুন্‌লুম। আমাদের মৌনতা ভঙ্গ করে বন্ধুবর বল্‌লেন, "প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ভাব-ধারার প্রভেদ এই দুইটী ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রাচ্য চায় শান্তি, আর প্রতীচ্য চায় সুখ। এমনিভাবে গঠিত যে শান্তি—নির্ম্মল নির্ব্বিকার শান্তি তখনই মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়, যখন এই নিখিল বিশ্বের গুড়তম প্রাণ-শক্তির সঙ্গে তার নির্ব্বিরোধ একটা মিলন সংস্থাপিত হয়। ঐ মোয়াজ্জিন তাই আকাশের দিকে মাথা তুলে প্রত্যহ পাঁচবার করে মানুষকে বিশ্বের সেই অদ্বিতীয় মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে তাকে বলে, ওহে দুর্ব্বল মানব এস, শান্তি যদি চাও তা'হলে সব ছেড়ে সেই মহাপ্রভুর কাছে চলে এসো। তাঁর কাছেই শান্তি পাবে, আর কোথাও পাবে না।

ইউরোপ কিন্তু সে শান্তি চায় না। সে শান্তিতে সে বিশ্বাসই করে না। মোয়াজ্জিন চায় আকাশের দিকে, আর ইউরোপ্‌ চায় মাটীর দিকে। মাটীর দিকে চেয়ে সে বলে "ওহে মানব, ও সব স্বপ্নাবিষ্টদের কথা শুনো না। ওরা তোমায় ভ্রান্তির পথহীন প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে যাবে। আমার কথা শুন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমায় যা শিখিয়েছে, তাই আমি তোমাদের বলছি,—বাজে কথা কিছু বলছি না। আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনই হচ্ছে একমাত্র বিশ্বাস্য সত্য; তার বাইরে আছে কেবল কুহেলিকা আর প্রহেলিকা। সেই কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রহেলিকাময় ভবিষ্যতের অনিশ্চিত মঙ্গলের অতি ক্ষীণ আশায়

বর্ত্তমানের নিশ্চিত সুখকে বিসর্জ্জন দেওয়া মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। আমার কথা শুন, বর্ত্তমানকে উপভোগ কর, ভবিষ্যতের ভাবনা ছেড়ে দাও।"

ওমার খৈয়াম ইউরোপের প্রাণের কথা এত পরিষ্কার করে বলেছেন বলেই তাঁর সেখানে এত আদর। 'Ah! take the cash in hand, and waive the rest ; oh! the brave music of a distant dreum!'

প্রাচ্যের প্রাণের কথা বলেছেন জালাল উদ্দিন রুমী, আর তাই তাঁর মসনবী আল্লার কালামের কোরাণের সঙ্গেই স্থান পেয়েছে।

'মা যে বালায়েম, ও বালা মিরওয়েম। মা বাসুয়ে আরশে মোয়াল্লা মিরওয়েম।' [আমরা আকাশ থেকেই এসেছি, আর আকাশেই ফিরে যাব। আমরা সেই আরসে মোয়াল্লার (আল্লার সিংহাসন) নিকটেই ফিরে যাব।] রুমীর এই কথায় ইউরোপ বিশ্বাস করে না। তাই সেখানে তাঁর আদর নাই; না হলে, প্রতিভার হিসাবে, কবিত্বের হিসাবে তাঁর স্থান খৈয়ামেরও অনেক উচ্চে। ইউরোপের চোখ মাটীর দিকে, তাই মাটীর জিনিষেরই সেখানে আদর, রুহানী (আধ্যাত্মিক) আর নূরানী (স্বর্গীয় আলোকের) জিনিষের আদর সে কি বুঝবে!

আমি বল্লুম "সামান্য একটা ঘটনা থেকে অত বড় একটা theory কয়েম করা যায় না। ইউরোপে অনেক লোক আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জিনিষকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেন আর আমাদের এই প্রাচ্যেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের কাছে আত্মার কোনই মূল্য নাই।"

বন্ধু বললেন "তা হতে পারে বটে। এদেশেও নাস্তিকের সংখ্যা যথেষ্ট, আর ইউরোপে উচ্চ হৃদয় ভগবদ্বিশ্বাসীর সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে আমাদের এই প্রাচ্য সভ্যতার গতি হচ্ছে পরমার্থের দিকে আর পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি হচ্ছে অর্থের দিকে। এই প্রভেদ যে দুইটী সভ্যতার মূলগত, সে বিষয় সন্দেহ করবার কোন

কারণ নাই। ধর্ম্মের অভ্যুত্থান যখন পৃথিবীতে হয়েছে তখন প্রাচ্য থেকেই হয়েছে; আর বৈষয়িক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ আমরা ইউরোপেই দেখ্‌তে পেয়েছি।"

বন্ধুর কথার উত্তরে আমি বল্লুম "আপনি যা বল্লেন আংশিক ভাবে সেটা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু এর ফল আমাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হয় নি। প্রাচ্যে লোকের আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর ক'রে, পুরোহিত-তন্ত্রতার বিষময় সত্তাকে সমাজে দৃঢ়, অতি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে, সভ্যতা আমাদের মধ্যে তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে হতশ্রী, হীনপ্রভ এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকে এই পুরোহিত-তন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত ক'রে, অসাধারণ চলৎ-শক্তি লাভ করেছে, আর তারই ফলে সে আজ সর্ব্বত্র প্রাচ্য সভ্যতাকে দলিত মথিত ক'রে ফেলেছে।"

বন্ধুবর হতাশ ভাবে বল্‌লেন "সেটা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নাই। আচ্ছা তা হলে কি আপনি মনে করেন আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বস্তু-তন্ত্রই সভ্যতার শ্রেষ্ঠতর ভিত্তি?" একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বন্ধু তাঁর অন্তরের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করলেন।

আমি হেসে বল্লুম "অত শীঘ্র হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না বন্ধু! আধ্যাত্মিকতার মূল্য আমি অস্বীকার করছি না, আমি কেবল বলছি, বস্তু জিনিষটাকে বাদ দিলেও সংসার চলতে পারে না। আত্মার উপর বেশী জোর দিলে আমরা মায়াবাদের উষর মরুক্ষেত্রে গিয়ে পৌছুই; আর বাস্তব জগতের উপর বেশী জোর দিলে আমরা গিয়ে পৌছুই জড়বাদের অরণ্যানীতে! এই দুই চরম পথের মাঝামাঝি যে পথ, সেইটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত পথ। ইউরোপ উন্নতি তখনি করেছে যখন আত্মাকে সে একটা বিরাট্ চিরন্তন সত্য বলে স্বীকার করেছে যখন এই দৃশ্যমান্ জগৎটাকে আমরা তাচ্ছিল্যের চোখে

দেখতে শিখিনি! যখন ইউরোপ আত্মাকে ছেড়ে কেবল বস্তু (matter)-কেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তখনই তার দুর্দ্দশা ঘটেছে, পক্ষান্তরে matterকে ছেড়ে কেবল আত্মা আত্মা ক'রে যখন আমরা পাগল হয়েছি, তখনই আমরা মরেছি।"

"মানুষ কেবল আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে চলতে পারে না। যে তা করবে, তাকে শেষে হোঁচট খেতেই হবে। সুফি আর সাধুদের কথা শুনে সে চেষ্টা যখন আমরা করেছি, তখনই তার শাস্তি পেয়েছি। পক্ষান্তরে নাস্তিকদের মত কেবল মাটীতে নাক ঘষে চললে প্রকৃত জীবন থেকে আমরা বঞ্চিত থাকবো। ইউরোপে এ দুর্দ্দশা অনেকবার ঘটেছে। আত্মায় যে বিশ্বাস করে না, তার মত দরিদ্র পৃথিবীতে কেউ নেই।

"প্রকৃত কথা কি জানেন? কেবল Ragtime নিয়ে থাকলেও চলে না, আর কেবল উপাসনা নিয়ে থাকলেও চলে না। আমাদের প্রাণ যখন এই দুইটাই চায় তখন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্ম। এই দু'য়ে মিলে যে জীবন, সেই হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক জীবন।"

উৎসাহের সঙ্গে আমার হাতটী তাঁর মুঠার মধ্যে নিয়ে বন্ধুবর বল্লেন "ঠিক বলেছ ভাই! অনেক দিন থেকে যা নিয়ে আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল তোমার কথা শুনে তার আজ সমাধান হলো। আজ আমি বুঝলুম— সত্য আমাদেরও একচেটিয়া নয়, আর ইউরোপীয়দেরও একচেটিয়া নয়। এই দুই সভ্যতার মূল অংশ নিয়ে এক ব্যাপকতর এবং পূর্ণতর নূতন সভ্যতার গঠন করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। আমাদের প্রকৃত পথ হচ্ছে মিলনের, বিরোধের নয়।"

সস্নেহে বন্ধুর হাতটী নাড়া দিয়ে আমি বল্লুম "এইটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।"

প্রকৃতির কবিত্ব

ঝড়, তুফান আর বৃষ্টি। মেঘে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার। অদূরের সমুদ্র সেই গভীর অন্ধকারে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেবল তার গভীর বিরাম হীন হুঙ্কার—অন্তরে এক অব্যক্ত আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল। শোঁ শোঁ রবে বাতাস বইছিল। মেঘের গর্জ্জনে কান বধির হয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ খড়্গের মত প্রকৃতির অন্তরকে নির্ম্মম ভাবে বিদীর্ণ করছিল। বারিধির বিক্ষুব্ধ বীচিমালা, গভীর রোলে, ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত উল্লম্ফনে তটের উপর নিজেদের নিক্ষেপ করছিল। উপরের ফেনরাশি ক্রুদ্ধ সরীসৃপের মতই অন্ধকারে ছুটাছুটি করছিল।

একা আলোকহীন বারান্দায় বসে সম্মোহিতের মত আমি এই অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখছিলুম। মনে হচ্ছিল যেন বিশ্বের পঞ্চভূতের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর এক যুদ্ধ বেঁধেছে। অপূর্ব্ব এক ভাবাবেশে আমি তন্ময় হয়ে পড়লুম। মানুষের কবিত্ব যে প্রকৃতির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সেই সত্যটা বিশেষ করেই তখন হৃদয়ঙ্গম করলুম। হোমার এবং ফেরদৌসির মহাকাব্যগুলিও প্রকৃতির এই কাব্য-প্রয়াসের কাছে একান্ত তুচ্ছ বলে মনে হল।

বস্তুতঃ কবিত্বের স্বাদ যদি কারও থাকে, মানুষের লেখা পুঁথি ছেড়ে তাহলে তাকে যেতে হবে প্রকৃতির কাছে। মানুষের কবিত্ব প্রকৃতির কবিত্বকে কখনও স্পর্শও করবে না। মহাকবি Wordsworth-এর জ্ঞানের গভীরতা তখন নূতন করে উপলব্ধি করলুম। তিনি যে মানুষ ছেড়ে, মানুষের লেখা পুঁথি ছেড়ে প্রকৃতির লীলাভূমিতে কেন আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশ তা বুঝতে পারলুম।

চলার শেষ

অদ্ভুত এক দৃশ্য। অতুলনীয় রূপবতী এক নারী দেখতে পেলুম গভীর জঙ্গলের মধ্যে। নানা রকমের শঙ্খ, প্রস্তরখণ্ড, পক্ষীর পালক প্রভৃতিতে দেহ তাঁর বিভূষিত। বর্ব্বর বেশভূষা সত্ত্বেও সুন্দরীর মাধুর্য্য, লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্য মনকে আমার মুগ্ধ করলে। সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসলেন আর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বললেন, "আমার অনুসরণ কর!" মোহমুগ্ধের মত আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলুম।

কতক্ষণ এভাবে চলেছিলুম জানি না। হঠাৎ সুন্দরীর দিকে চাইলুম। বেশভূষা তাঁর বদলে গেছে। তিনি মহামূল্য অঙ্গাবরণ পরেছেন। দেহে তাঁর রত্নখচিত আবরণ শোভা পাচ্ছে। আমি তাঁর বেশভূষা দেখে মুগ্ধ হলুম। তবে সে বেশভূষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই উপযোগী। সুন্দরী মধুর হাস্যে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে আসছ তো?" আমি বললুম, "নিশ্চয়।"

খানিকক্ষণ অনুসরণ করবার পর আবার সুন্দরীর দিকে চাইলুম। বেশভূষা তাঁর আবার অভিনব রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন পশুর চর্ম্ম দেহকে তাঁর আবৃত করেছে। সে সব চর্ম্মের শোভা বর্ণনার অতীত। সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কেমন দেখাচ্ছে?" আমি বল্লুম, "বর্ণনার অতীত!" সুন্দরী বল্লেন, "আমার অনুসরণ কর।" আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলুম।

এইভাবে সুন্দরী নিত্য নূতন বেশে, নিত্য নূতন ভূষায় দেখা দিতে লাগলো। নিত্য নূতন বিস্ময়ে অন্তর আমার অভিভূত হতে লাগলো।

তারপর দেখলুম সুন্দরী বস্তুর তৈয়েরী বেশভূষা ছেড়ে অমল, উজ্জ্বল আলোকের

বিভিন্ন রংএর অপূর্ব্ব অঙ্গাভরণে নিজেকে সজ্জিত করেছেন; তাঁর গতি আলোর চেয়েও দ্রুত। তাঁর সৌন্দর্য্য আলোর চেয়েও মনোমুগ্ধকর। বিস্ময় আমার বাড়তে লাগলো। আবিষ্টের মত আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলুম। আমার জড় দেহ ক্রমেই যেন লঘু হয়ে যাচ্ছিল। আমার গতিবেগও দ্রুত হয়ে যাচ্ছিল।

পৃথিবী ছেড়ে সুন্দরী আকাশপথে উঠলেন। আমার পাখা ছিল না, তবু কিন্তু আমি অবাধে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলুম।

কখন জানি না সুন্দরী তাঁর অঙ্গাবরণ, তাঁর রত্নাভরণ, তাঁর অতুলনীয় সুষমামণ্ডিত দেহ সমস্ত বর্জ্জন করে এক অভিনব রূপ ধারণ করেছিলেন যার বর্ণনা ভাষায় করা যায় না। নক্ষত্রের চেয়েও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি আকাশপথ অতিক্রম করে চলেছিলেন। নিজের দিকে চেয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। আমার দেহ নাই অথচ আমি উড়ে চলেছি, চোখ নাই অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি; ত্বক্ নাই অথচ আবহাওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন অনুভব করছি।

সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''কেমন লাগছে?" আমি বললুম "লাগছে ভালই। তবে দাঁড়াব কোথায় গিয়ে আমি? তোমার সঙ্গে দুটা কথা বলবার অবসরই বা কখন পাব?"

সুন্দরী বললেন, "কেন? চলতে কি কোন দুঃখ আছে?" আমি বললুম "না দুঃখ নাই। তবে দাঁড়াতেও তো ইচ্ছা হয়। তোমার সঙ্গে একটু কথা বল্‌তেও তো সাধ যায়!"

সুন্দরী বললেন, "ঐ উপরের দিকে চেয়ে দেখ!"

আমি চাইলুম। যা দেখলুম তা বর্ণনার অতীত। আলোকের জগতে আলোকবিহারী জীবেরা অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলছিল, গাইছিল, আনন্দ করছিল। তাদের সৌন্দর্য্য, তাদের গতির মাধুর্য্য তাদের আলোকময় দেহের বিভূতি সবই কল্পনার

অতীত, বর্ণনার অতীত। অদূরে বিভিন্ন রংএর আলোকের উপাদানে গঠিত বিচিত্র এক সিংহাসন। সুন্দরীই সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর সৌন্দর্য্য কিন্তু আরও সহস্র গুণে বেড়ে গিয়েছে। তাঁর রূপের আভায় বিশ্বচরাচর আলোকিত হচ্ছে। সুন্দরীর পাশে আমারই মত কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমার দেহে যে অমন সৌন্দর্য্য, অমন মাধুর্য্য, অমন দেবদুর্ল্লভ বিভূতি দেখা দিতে পারে সেটা ভাবতেও আমার সাহস হল না।

হঠাৎ সঙ্গিণীর কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। মধুর হাস্যে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন "কেমন লাগল" ? স্বপ্নোত্থিতের মত আমি বললুম, "যা দেখলুম তা বর্ণনার অতীত, কল্পনার অতীত।"

পুনরায় উপরের দিকে আমি চাইলুম। সেই অপরূপ দৃশ্য কিন্তু আর দেখতে পেলুম না। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে ফিরে চাইলুম। তিনি বললেন, "গন্তব্যের একটা ছবি তোমায় দেখালুম। এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

আবিষ্টের মত অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে আমি সুন্দরীর অনুসরণ করে চললুম।

ভিক্ষুক।

তোমার দ্বারে অনেক ভিক্ষুক বসেছিল। আমিও গিয়ে বসলুম। তুমি এলে—সৌন্দর্য্যের ছটায় দশদিক আলো করে !

সসম্ভ্রমে আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালুম। তুমি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলে 'তুমি কি চাও', 'তুমি কি চাও' ?

কেউ বললে 'আমি চাই ধন দৌলত,' কেউ বললে 'আমি চাই গয়না আর মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদ', কেউ বললে 'আমি চাই পদ আর সম্মান!' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তুমি বললে 'তুমি কি চাও?'

আমি বললুম 'তোমার রুদ্র মুর্ত্তিটা একবার দেখতে চাই!' তোমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল! তুমি বললে 'অদ্ভুত প্রার্থনা! পাগল নাকি।'

যে যা চেয়েছিল তাকে তাই দিয়ে তুমি বিদায় দিলে। তার পর আমাকে সম্বোধন করে বল্‌লে 'যাও পাগল! যাও এখন!'

আমি বললুম 'সত্যই কি আমাকে যেতে বলছ?' তুমি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্‌লে 'আমি মিথ্যা বলি? শিগগীর যাও বলছি, না হলে ভাল হবে না! এ দেখছি একটা বদ্ধ পাগল!'

আমি বললুম 'যেতে বলেছ, তখন যাবই। তোমার রুদ্র মুর্ত্তি দেখতে পেলুম, এই আমার সৌভাগ্য!

তোমার আস্তানা ছেড়ে আমি চলতে আরম্ভ করলুম। ব্যগার আমেজ মিশান স্বরে তুমি বললে 'শোন, শোন, একটা কথা আছে!'

আমি ফিরলুম। ব্যগ্র কণ্ঠে বললুম 'বল, বল, কি বলবার আছে বল! তোমার অমৃত বাণী শোনবার জন্য সদাই আমি ব্যাকুল!'

সলজ্জ কণ্ঠে তুমি বললে 'আজ না হয় এখানেই থাক!'

আমি বললুম 'সত্যই আমি কৃতার্থ! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে?'

কুটিল কটাক্ষ হেনে তুমি বললে 'আমরা হলেম স্বজাতি, বুঝলে?'

আমি বললুম 'প্রহেলিকা!' তুমি বললে প্রহেলিকা নয়, সরল সত্য!'

আমি বললুম 'অত সূক্ষ্ম বিচার করবার ক্ষমতা আমার নাই। যদি একটু স্পষ্ট করে বল তা হলে বুঝি!'

স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তুমি চাইলে। এ সৌভাগ্য পূর্ব্বে কথনও

আমার হয়নি। তোমার কণ্ঠস্বর মধুর সঙ্গীতের মত আমার কানে ঝঙ্কৃত হতে লাগলো। তুমি বললে তুমিও ভিক্ষুক আর আমিও ভিক্ষুক! তুমিও পাগল আর আমিও পাগল! তুমি সৌন্দর্য্যের ভিখারী, সৌন্দর্য্যের তরে পাগল; আর আমি প্রেমের ভিখারী, প্রেমের তরে পাগল! তুমি রত সুন্দরের সন্ধানে, আর আমি রত প্রেমের, নিঃস্বার্থ প্রেমের সন্ধানে! এখন বল দেখি আমরা স্বজাতি কি না?

আমি বললুম 'এতক্ষণে বুঝলুম কেন আমি তোমার রুদ্র মূর্ত্তি দেখতে চেয়েছিলুম।'

বক্রহাস্যে তুমি বললে 'এও কি বুঝলে, কেন তোমায় আমি থাকতে বলেছিলুম?'

রাজর্ষি মার্কাস অরেলিয়াস

সাধারণ একটা ধারণা আছে যে রোম সাম্রাজ্য যেমন বিলাসিতার তেমনি নাস্তিকতার চরমে পৌঁছেছিল, খৃষ্টান ধর্ম্মের আবির্ভাবের সময়। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যে বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় ভাবুক এবং ভক্ত জন্মেছেন যাঁদের উচ্চ ভাবধারা, অনাবিল চরিত্র এবং বিশ্বপ্রেম যে কোন জাতির এবং দেশের অনুকরণীয় হতে পারে। প্লুটার্ক, সেনেকা, মার্কাস অরেলিয়াস প্রভৃতি মহামনস্বীরা বিশ্বকে যা দান করে গেছেন মানুষ কখনও তা ভুলতে পারবে না। এখন শেষোক্ত মহাপুরুষের বিষয়ই দু'চার কথা বলা যাক্।

মার্কাস অরেলিয়াস হচ্ছেন অন্যতম প্রথিতযশা রোম সম্রাট্। পিতার মৃত্যুর পর ১৬১ খৃঃ অব্দে তিনি রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২১ খৃঃ অব্দে। মৃত্যুর সন ১৯০ অব্দ। সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বেও তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শাসনকার্য্যে, যুদ্ধে সর্ব্ব বিষয় তিনি অসাধারণ নিপুণতা দেখিয়ে গেছেন। আর চিন্তা এবং ভাবের চর্চ্চায় তিনি যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন দেশে এবং যে কোন সভ্যতায় দুর্ল্লভ। এখানে তার meditation থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে বাঙ্গালী পাঠককে এই মহামনা সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন তুমি যদি মানব জীবনে ন্যায় বিচার সতত সংযম এবং তিতীক্ষার চেয়ে কাম্যতর কিছু পাও; এক কথায়, তোমার এই আনন্দানুভূতি, যে, তুমি বুদ্ধি এবং বিবেকের নির্দ্দেশ মত তোমার মনকে এই পৃথিবীতে পরিচালিত করছ, যেখানে তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমাকে পাঠান হয়েছে; সত্যই যদি তার চেয়ে কাম্য কিছু পাও, তাহলে সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে তুমি গ্রহণ কর, আর যাকে তুমি শ্রেষ্ঠতর পথ বলে বিবেচনা কর, আনন্দে তার অনুসরণ কর।

কিন্তু তোমার অন্তরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁর চেয়ে প্রিয়তর কিছু যদি দেখতে না পাও, আমি সেই দেবতার কথা বলছি যিনি তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিনিচয়কে তাঁর শাসনে এনেছেন, যিনি তোমার বিভিন্ন অনুভূতিকে অতি সাবধানে পরীক্ষা করেন, যিনি সক্রেটিসের ভাষায় রিপুর প্রলোভন থেকে তোমায় মুক্ত করেছেন, যিনি দেবতাদের ইচ্ছা এবং মানব-মঙ্গলের নির্দ্দেশ মত তোমার জীবনকে পরিচালিত করেন; আর তুমি যদি বুঝতে পার, যে, সেই দেবতার মূল্য সব চেয়ে বেশী, তাঁরই আসন সবার উচ্চে, তাহলে তাঁকে ছেড়ে আর কিছুর অনুসরণ করো না; কেননা, একবার যদি তুমি বিপথে যাও, একবার যদি তুমি রিপুর অনুসরণ কর, তাহলে

মঙ্গলের পথে, তোমার নিজস্ব পথে, অবিচলিত ভাবে চলা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে।

এ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যা ন্যায্য, এবং যা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তার সঙ্গে অন্য কোন জিনিস, যেমন লোকের প্রশংসা, কিংবা ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি, কিংবা আমোদপ্রমোদ প্রতিযোগিতা করবার সুযোগ লাভ করে। এই শেষোক্ত জিনিসগুলি (যদিও কখনও কখনও আমাদের মনে হয়, যে তাদের সাহায্যে উচ্চতর আদর্শ কতকাংশে উপলব্ধি করা যেতে পারে) সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই আমাদের অন্তরকে দখল করে বসে। আর আমাদের পথভ্রষ্ট করে।

আমি তাই বলি, তুমি সরল এবং এক নিষ্ঠভাবে শ্রেষ্ঠতর পথ গ্রহণ কর, এবং অবিচলিত ভাবে সেই পথেরই অনুসরণ কর।

যা প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর, সেই হল শ্রেষ্ঠতর পথ। সুতরাং কোন বিশেষ পথ যদি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে তোমার পক্ষে কল্যাণকর হয়, তাহলে সেই পথেরই অনুসরণ কর। আর যদি কোন পথ, জন্তু হিসাবে তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়. তাহলে, সে কথা স্পষ্ট স্বীকার করো, আর আস্ফালন না করে, তোমার অভিরুচি মত চলো। তবে, এটুকু অন্ততঃ করো, কোন্ পথ যে প্রকৃতপক্ষে বাঞ্ছনীয়, ধীর স্থির বুদ্ধির সাহায্যে তার বিচার করো।

এমন কোন জিনিসকে কখনও তোমার পক্ষে লাভজনক বলে মনে করো না, যার দরুণ তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হয়, আত্মসম্মান হারাতে হয়, বিদ্বেষ পোষণ করতে হয়, সন্দিগ্ধচিত্ত হতে হয়, লোককে অভিশাপ দিতে হয়, ভণ্ডামি করতে হয়, কিংবা সেই সব কাজ করতে হয়, এবং সেই সব পথের অনুসরণ করতে হয়, যাদের প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য দেওয়াল কিংবা পর্দার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

যে ব্যক্তি তার বিচার বুদ্ধিকে এবং তার অন্তরে অধিষ্ঠিত দেবতাকে সবার

ঊর্দ্ধে স্থান দেয় এবং সেই অন্তর-দেবতার গৌরব রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকে, সে নিজেকে কখনও শোকে অভিভূত হতে দেয় না, সে অসংযতভাবে বিলাপ করে না। সমাজ থেকে পালাবার জন্য সে ব্যগ্রতা দেখায় না, আর সামাজিক জীবনের জন্যও সে আগ্রহান্বিত হয় না। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও ব্যগ্র হয় না, আর পঞ্চভূতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবারও চেষ্টা করে না। তার আত্মা দেহের মধ্যে বেশী দিন থাকবে কি কম দিন থাকবে, তা নিয়ে সে চিন্তিত হয় না। তাকে যদি এই মুহূর্ত্তেই দেহ ত্যাগ করতে হয়, তাহলেও একান্ত স্বাভাবিক এবং নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই সে তা করে; ঠিক যে ভাবে সে তার জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্যাদি করে থাকে, একান্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে এবং একান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে। জীবন পথে কেবল একটীমাত্র আদর্শের কথা মনে রেখে সে চলে—মন কখনও তার যেন জ্ঞান এবং বিবেকসম্পন্ন সামাজিক জীব হিসাবে নিজেকে পরিচালিত করতে কুণ্ঠিত না হয়।

যার মন নির্ম্মল, তার মধ্যে তুমি অপবিত্র কিছু পাবে না, অবাঞ্ছনীয় কিছু পাবে না, কলুষিত কিছু পাবে না, প্রচ্ছন্ন কোন ক্ষত তার মধ্যে তুমি পাবে না। নিয়তি যখনই তার প্রাণ হরণ করতে আসুক, তার জীবনে সে অসম্পূর্ণ কিছু দেখতে পাবে না।

পালা শেষ হবার পূর্ব্বে একজন অভিনেতাকে যদি রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করতে হয়, তার বিষয় আমরা বলি, কাজ শেষ করবার পূর্ব্বেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। আদর্শ যুক্তিপন্থী মানুষের বিষয় কিন্তু সে কথা বলা চলে না। তা' ছাড়া তার মধ্যে তুমি দাস মনোবৃত্তির কোন চিহ্ন পাবে না; কোন প্রকার কৃত্রিমতা পাবে না। জীবনের কোন বিশেষ জিনিসকে সে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে না; অথচ জীবনকে সে বর্জ্জনও করে না। তার মধ্যে তুমি নিন্দনীয় কিছু পাবে না। এমন কিছু পাবে না যা সাধারণের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন রাখা দরকার।

যে মনোবৃত্তি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে, অর্থাৎ তোমার বিচার বুদ্ধিকে তুমি ভক্তি করবে। তোমার মনে জ্ঞান-সম্পন্ন প্রাণীর অযোগ্য কোন বাসনার থাকা না থাকা তোমার বিচার বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে। এই বিচার-বুদ্ধিই একদেশদর্শী মতবাদ থেকে তোমায় মুক্ত রাখে, মানুষের প্রতি তোমার মনে স্নেহ-ভালবাসা উদ্রেক করে, আর তোমাকে দেবতাদের অনুগত করে।

সব ছেড়ে এই সরল সত্যগুলিই অবলম্বন করে থাকবে। আর মনে রাখবে যে, মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর বর্ত্তমান কালের অবিভার্য্য একটি বিন্দুমাত্র। জীবনের অবশিষ্ট অংশ হয় বিগত অথবা অনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে কালের যে খণ্ডাংশে মানুষ প্রকৃতই জীবন্ত, সেটা একান্তই সংক্ষিপ্ত। আর যে স্থানে সে সত্যই বিরাজ করে, সে স্থানও অতি সংকীর্ণ। আর মৃত্যুর পরের যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি, তা সে যত ব্যাপকই হোক না কেন, সেও হচ্ছে একান্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। সে খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভর করে কতকগুলি স্বল্পজীবী অসহায় মানুষের উপর, যারা প্রকৃত পক্ষে এতই অজ্ঞ যে নিজেদের বিষয়ই তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই, যে লোক গত হয়েছে তাকে জানা তো দূরের কথা!

সহৃদয় পাঠক, বলুন এখন, এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শ কি হতে পারে।

সত্যই Marcus Aureliusএর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের একই ধর্ম্ম, তা তাঁরা যে জাতির, যে দেশের, যে যুগের এবং যে শ্রেণীর মানুষই হন না কেন। আর এ অনুভূতি আমাদের সব ধর্ম্মের, সব জাতির এবং সব সভ্যতারই প্রকৃত মহাপুরুষদের সম্মান করতে শেখায়, আর শিক্ষার জন্য, আদর্শের জন্য, প্রেরণার জন্য তাঁদের পদতলে আমাদের পাঠিয়ে দেয়।

স্মৃতির ফসল

জীবন চলেছে, একটা স্রোতের মত। কত কি ঘটছে কে তা মনে রাখে? এই কাল কি খেয়েছি, আজ আমার তা মনে নাই। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কোন কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল পাঠকের কি তা মনে আছে? তবে মানুষের জীবনে দু'একটা সোনালী মুহূর্ত্ত আসে যার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে; তার আর পরবর্ত্তী জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

কবি এবং সাহিত্যিকের জন্য এই সোনালী মুহূর্ত্তগুলি কোহিনুরের মতই অমূল্য। কেননা তাঁরা যা কিছু স্থায়ী জিনিস লেখেন, এই সোনালী মুহূর্ত্তগুলির প্রভাবেই লেখেন। এই অমূল্য মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার, পুলকপ্রেরণার দুর্ল্লভ এক সংমিশ্রণ ঘটে, আর তার দরুণই সেগুলি অমরত্ব লাভ করে—ঠিক যেন কোন মহাকবির দুর্ল্লভ শুভমুহূর্ত্তে রচিত অবিস্মরণীয় এক কাব্য।

পাঠকের মত আমার মনের মণিকোঠাতেও অনেকলি সোনালী মুহূর্ত্তের স্মৃতি সঞ্চিত আছে। সেই অমূল্য মুহূর্ত্তগুলির অধিকাংশই এসেছিল পাঁচ বৎসর থেকে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে। পরবর্ত্তী জীবনে সে রকম সোনালী মুহূর্ত্তের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। যখন পাঠশালায় পড়তুম তখনকার অনেকগুলি মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মনে সঞ্চিত আছে। অথচ কেম্ব্রিজ জীবনের একটি সোনালী মুহূর্ত্তের কথাও মনে পড়ে না।

আমার তাই মনে হয়, বড় হলে মানুষ যেমন ছড়া আর রূপকথা উপভোগ করবার সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলে, তেমনি তার মন সোনালী মুহূর্ত্ত উপভোগ করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। সোনালী মুহূর্ত্ত হ'ল শিশু-জীবনেরই সোনালী ফসল—দেবতাদের সভাতেই অমৃতের পরিবেশন হয়।

তবে যাঁরা আজীবন শিশু থাকেন, পরবর্ত্তী জীবনেও এই দুর্লভ অমৃত তাঁদের ভাগ্যে সময় সময় জুটে থাকে। কবি এবং সাহিত্যিকের কারবার হ'ল এই সোনালী মুহূর্ত্তগুলি নিয়ে। দেব সভার এই অমৃত নিয়ে। আমি তাই বলি, সত্যিকার যদি কবি হ'তে চাও, সত্যিকার যদি সাহিত্যিক হ'তে চাও; আজীবন তাহলে শিশু হয়েই থাকো। স্বর্গের অমৃত, সাহিত্যের প্রেরণা, সে সব শিশুরই জন্যে। দৈত্য-দানবের তাতে কোন অধিকার নাই।

তবে যতই চেষ্টা চরিত্র কর না কেন, শিশু-জীবনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক অনুভূতি পরবর্ত্তী জীবনে আর ফিরে পাবে না, সমুদ্র মন্থন করলেও না। পায়রার লাল পায়ে, আর তার পালকের দুধের সরের রংএ যে সৌন্দর্য্যের ঝলক শিশু-জীবনে দেখেছি, সে জিনিস এ জীবনে কখনও আর দেখব না। দীঘির জলের ঢেউয়ের খেলায় প্রকৃতির যে লীলায়িত নৃত্য দেখেছি মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-মালার নৃত্যেও সে জিনিস ভবিষ্যতে কখনও আর দেখবনা।

বয়সের সঙ্গে এই সূক্ষ্ম, অপার্থিব সৌন্দর্য্যানুভূতি মানুষ হারিয়ে ফেলে। মহাকবি Wordsworth আজীবন তাই বিগত শিশু-জীবনের জন্য চোখের জল ফেলেছেন। তবে প্রিয়া বিহনে যেমন প্রিয়ার চিন্তা মধুর, তেমনি শিশু-জীবন বিগত মানুষের জন্য শিশু-জীবনের চিন্তাও মধুর। আর এই মধুর অতীতের মধুর চিন্তা থেকেই আসে কাব্যে। এই মধুর চিন্তার মধ্যেই আছে সুন্দরের জন্য সেই করুণ ক্রন্দন যা হল প্রকৃত কাব্যের প্রাণ।

আরও একটা কথা এখানে বলে ফেলা যাক্। সবাই কিন্তু কবি হবে না, সাহিত্যিকও হবে না। তবে এ আশা অন্ততঃ পোষণ করি যে, আমাদের ছেলেরা সবাই মানুষের মত মানুষ হবে। স্পষ্টই যখন আমরা বুঝতে পারছি যে, শিশু-জীবনই হ'ল স্মৃতির সোনালী ফসলের সব চেয়ে ভাল ক্ষেত্র, হয়তো বা একমাত্র উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র; আর স্মৃতির এই সোনালী ফসলই জীবনে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর তার প্রেরণা জাগায়, তখন আমাদের শিশুদের জীবনের

চারিদিকে শ্রেয়-সুন্দরের চারু বেষ্টনীর সৃষ্টি করাই কি আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয়? কয়েকখানা বই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরস) পড়ালেই কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে চিন্তা, কল্পনা এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রেয় এবং সুন্দরকে মনের গভীরতম দেশে, অন্তরের অন্তরতম স্তরে পরিচালিত করা। তবেই গিয়ে আমাদের শিশুরা পরিণত বয়সে সেই সব মানুষ হবে যাদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমরা পৃথিবীর সম্মুখীন হতে পারব।

শিল্পী আর মহাশিল্পী

অন্তহীন বিশ্ব!

শিল্পী তা থেকে রচনা করেছে ক্ষুদ্রতর এক বিশ্ব! মহাশিল্পীর বিরাট্ বিশ্বের মতই শিল্পীর এ ক্ষুদ্র বিশ্বটাও এক দিক থেকে যেমন সীমার বন্ধনে আবদ্ধ, অন্যদিক থেকে তেমনি সীমার অতীত—অন্তহীন!

উভয় শিল্প-সাধনাতেই আছে কল্পনার খেলা! উভয় শিল্প-সাধনাতেই আছে পরিণতির প্রয়াস; উভয় শিল্পসাধনাতেই আছে অপূর্ণতার মর্ম্মব্যথা!

শিল্পী কি মহাশিল্পীর সন্তান?

পিতার যন্ত্রপাতি নিয়ে সে কি পিতারই বিরাট্ সাধনায় রত? তার সাধনায় পিতার কি কোন প্রয়োজন আছে?

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি তুমি আঁকছ? কেনই বা তুমি আঁকছ? তোমার আঁকার ছবির কি কোন প্রয়োজন আছে?

শিল্পী বললে, আঁকছি, যা মাথায় আসছে তাই! না এঁকে থাকতে

পারি না, তাই আঁকছি। প্রয়োজন না থাকলে সমস্ত বিশ্ব-শক্তি আঁকার দিকে আমাকে কেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বল দেখি ?

আমি বললুম, কি তোমার মাথায় আসে, আমায় বল !

শিল্পী বললে, যা নাই, আর যা থাকা উচিত, তাই আমার মাথায় আসে ; আর, তাই আমি আঁকি !

আমি বললুম উদ্দেশ্য ?

শিল্পী বললে, থাকা উচিত—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আর কি ?

মহাশিল্পীকে বললুম আপনি কি আঁকছেন ? আর কেনই বা আঁকছেন ?

তিনি বললেন, যা মাথায় আসে তাই আঁকি, আর না এঁকে থাকতে পারি না, তাই আঁকি !

আমি বললুম, কি মাথায় আসে তাই আমায় বলুন !

মহাশিল্পী বললেন যা নাই, আর যা থাকা উচিত, তাই আমার মাথায় আসে, আর তাই আমি আঁকি !

আমি বললুম হেঁয়ালি !

মহাশিল্পী বললেন, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, অসুন্দরকে তাড়াতে চাই ; বিদ্যাকে আনতে চাই ; অবিদ্যাকে বিদায় দিতে চাই ; শ্রেয়কে ওঠাতে চাই ; অ-শ্রেয়কে নামাতে চাই !

আমি বললুম, যা নিয়ে শিল্পীর কারবার, আপনারও দেখেছি তাই নিয়ে কারবার !

মহাশিল্পী বললেন, তা ত বটেই !

আমি বললুম সে কি আপনার শিষ্য ?

মহাশিল্পী বললেন, শিষ্য আমার মনের কথা জানবে কি করে ?

আমি বললুম, কে সে, তা হলে ?

মহাশিল্পী বললেন, সন্তান।

আমি বললুম, তার মানে ?

মহাশিল্পী বললেন, তার অন্তর আমার অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি !

আমি বললুম, তার জীবনে তাহলে এত ব্যর্থতা কিসের জন্য ?

মহাশিল্পী বললেন, আমার জীবনও তো ব্যর্থতায় ভরা !

আমি বললুম, তাহলে বলুন, আপনার ক্ষমতারও সীমা আছে ?

মহাশিল্পী বললেন, সীমার সৃষ্টি আমি করি, আবার সীমাকে অতিক্রমও আমিই করি !

আমি বললুম, শিল্পীরা এই একই কথা বলে, এর সার্থকতা কোথায় ?

মহাশিল্পী বললেন, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়, সৃষ্টির আনন্দে !

আমি বললুম, শিল্পীও তাই বলে !

মহাশিল্পী বলবেন, আমিই এ তত্ত্ব তাকে শিখিয়েছি !

আমি বললুম, শিল্পীর সাধনার আপনার কি প্রয়োজন ? আপনি তো প্রয়োজনের উর্দ্ধে !

মহাশিল্পী বললেন, কে বললে আমি প্রয়োজনের উর্দ্ধে ? সমস্ত সৃষ্টিই তো আমার প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ ! শিল্পীর কল্পনা দিয়েই আমি রূপের ধ্যান করি ; শিল্পীর কামনা দিয়েই আমি রূপের সাধনা করি ; আর শিল্পীর তুলি দিয়েই আমি রূপের ছবি আঁকি !

আমি বললুম, এতক্ষণে বুঝলুম !

মহাশিল্পী বললেন, সহস্র মুখ দিয়ে কথা বলছি, তোমার না বোঝাই বিচিত্র !

রেল ভ্রমণ

পায়ের সফরের কথা, ঘোড়ার সফরের কথা, মোটরের সফরের কথা, নৌকার সফরের কথা, বিমানের সফরের কথা অনেক শুনতে পাই। এ-সবের বর্ণনায় অনেকে কবিত্ব ফলিয়ে থাকেন, উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা ছুটিয়ে থাকেন, ভাবের বন্যা বহিয়ে থাকেন। রেলের সফর নিয়ে কিন্তু কাকেও উচ্ছ্বসিত হ'তে এখন পর্য্যন্ত দেখিনি। সাহিত্যের প্রাসাদে সে বেচারী গরীব Cindrellaর মত সকলের অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে। কেউ তার কথা ভাবে না, কেউ তার কথা বলে না, কেউ তার কথা লেখে না। তার মধ্যে যেন কোন সৌন্দর্য্য নেই, কোন মাধুর্য্য নেই, কোন কবিত্ব নেই। সাহিত্যের অভিজাত দরবারে তার যেন প্রবেশাধিকার নেই। উপেক্ষিত হওয়াই যেন তার অদৃষ্টের বিধি।

আজ যেমন রেলের সফর সাহিত্যে অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে, স্বভাবের প্রাণ-মাতানো সুষমাও এই রকম একদিন অনাদৃত এবং অকীর্ত্তিত হয়ে পড়েছিল। তারপর এলেন কবি Wordsworth। তিনি গাছ পালায়, লতায় পাতায়, মাঠে বনে, পাহাড়ে প্রান্তরে, সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ভাবের অনন্ত উৎস, আনন্দের অনাবিল প্রবাহ দেখতে পেলেন। রাজা রাণীদের প্রেম প্রণয়, দেবদেবীদের ঝগড়া ঝাঁটি প্রভৃতি বড় বড় তত্ত্ব ছেড়ে তিনি এই স্বভাব সুন্দরীর স্তব স্তুতিতে তাঁর প্রতিভা উৎসর্গ করলেন। জগতের চোখ খুলে গেল। নৈসর্গিক শোভা ভাবরাজ্যে তার প্রাপ্য আসন পেলে। সাহিত্য নূতন এক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'ল।

রেলের সফর এখনও তার Wordsworthএর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি এলে লোক এরই মধ্যে নূতন অনুভূতির সন্ধান পাবে, এরই মধ্যে ভাবের নূতন উৎস প্রচ্ছন্ন দেখবে, আর এর ভ্রাম্যমান জীবন-লীলায় বিশ্বজীবনের

একটী সুন্দর সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদে ভরা ছবি দেখে মোহিত হবে। রূপকথার রাজকুমারী যেমন কোন ভাগ্যবান্ রাজকুমারের সংস্পর্শে জেগে উঠেছিলেন, রেলের সফরও তেমনি কোন ভাগ্যবান্ কবির লেখনীর স্পর্শে তার অনুপম সৌন্দর্য্য নিয়ে জেগে উঠবে। অন্ধ জগৎ তখন চক্ষুষ্মান হয়ে বলবে—'কি সুন্দর!' 'কি সুন্দর!'

কাজের জন্য, আমোদের জন্য, কাজ আর আমোদ উভয়ের জন্য রেলের সফর অনেকবার আমাকে করতে হয়েছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বরং নানা অসুবিধা সমেত এই রেলের সফরে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। আর এই সফরে আমার প্রাণে ভাবের যে প্রবাহ বয়েছে, অনুভূতির যে উচ্ছল তরঙ্গ উঠেছে, তার জন্য রেলের সফর, চিরকাল আমার কাছে আদরের জিনিস হয়ে থাকবে, আর এই সফরের সৌভাগ্য আবার যখন আমার কপালে খটবে তাকে তখন আমি আনন্দে বরণ করে নেবো।

পাঠক কখনও গভীর পূর্ণিমা রাত্রে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একা ট্রেণের সফর করেছ কি? যদি করে থাক তা হ'লে বুঝবে সে সফর কবিত্বশূন্য নয়; তা হ'লে বুঝবে সেই অনাদৃত ট্রেণের সফরেই প্রকৃতির সেই মহান্ ভাব, নিসর্গের সেই প্রাণ-মাতানো সৌন্দর্য্য, স্বভাবের সেই শান্তিময় সুষমা দেখতে পাওয়া যায়, যার জন্য মানুষ লোকালয় ছেড়ে বিজন কাননে যায়, দেশ ছেড়ে বিদেশের পথ নেয়, আর সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ে পর্ব্বতে বিচরণ করে। প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ট্রেণ হুসহুস করে চলতে থাকে, আর দিগন্ত বিস্তারিত নিঃশব্দ প্রকৃতি তার রহস্য ভাণ্ডারের প্রাণ-মাতানো দৃশ্যগুলি একে একে ভাবুকের চোখের সামনে খুলে দেয়। তখন মনে হয় যেন কোন অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন চিত্রকর তাঁর চিত্রাগারের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি যত্নের সাথে এক একটী করে আমাদের দেখাচ্ছেন এক অপূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ এখন ভরে যায়। ক্ষণিকের তরে আমরা নিরঞ্জনের ভাবধারার প্রত্যক্ষ একটা আভাস পাই। যাত্রা আমাদের সার্থক হয়।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ভ্রাম্যমান নৈসর্গিক শোভাই ট্রেণের সফরের একমাত্র

উপভোগ্য Experience নয়। অল্প এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বিচিত্র রূপের এমন বিভিন্ন প্রকাশ আর কোন্ সফরে আমরা দেখতে পাই? জলা জাঙ্গাল, মাঠ মরুভূমি, পাহাড় প্রান্তর অপূর্ব্ব অনুক্রমে আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত হ'তে থাকে। বিশ্ব জগতের একের মধ্যে বহুত্ব এবং বহুর মধ্যে একত্ব তখন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়। মন তখন এক অপূর্ব্ব সার্ব্বভৌমিক ভাবে ভরে যায়।

তারপর ট্রেণের এই সংক্ষিপ্ত সফরের মধ্যে মানব জীবনের কি সুন্দর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই! দৈনন্দিন জীবনে আমরা এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়ে থাকি। তারা আমাদেরই সমাজের লোক, আর তাদের জীবনযাত্রা এবং ভাবের ধারা আমাদেরই অনুরূপ। তাদের মধ্যে নূতন বড় একটা কিছু পাই না। ট্রেণের সফরে কিন্তু এই চির অভ্যস্ত জগৎ ছেড়ে অভিনব এক জগৎ দেখবার বিশেষ একটা সুযোগ আমাদের হয়ে থাকে। আর সেই সুযোগে এমন অনেক জিনিস আমরা দেখে নিই যা আমাদের বেষ্টনীর গণ্ডীর মধ্যে কখনও দেখতে পেতুম না। সভ্যাসভ্য সব শ্রেণীর মানুষের অন্তরে উঁকি মারবার সুযোগ যেমন ট্রেণে পেয়েছি, তেমন আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না।

হাওড়া থেকে একবার দিল্লী পর্য্যন্ত সফর করুন। পথের মধ্যে কত বিচিত্রতা, কত বিভিন্নতা, কত Local peculiarities কত রং বেরংএর কাপড় পরে মানুষ উঠছে নামচে, কত ভাষায় তারা কথা বলছে, কত রকম লোটা ঘটি নিয়ে সংসার চালাচ্ছে, কত রকমের বাহনে চড়ে ষ্টেশনে আসছে, আর কত রকমের বাহনে চড়ে ষ্টেশন থেকে যাচ্ছে! সমস্ত Macrocosmosটা যেন একটা Microcosmos এর মধ্যে দেখা দিচ্ছে!

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মিলন, বিরহের যে ছবি আমরা রেলের ষ্টেশনে দেখি, তেমন আর কোথায় পাই! কোথাও বাপ-মা চোখের জলে তাদের

ছেলে-মেয়েদের বিদায় দিচ্ছে, কোথাও কোন প্রণয়িনী ব্যগ্রতার মূর্ত্তিমত। বিগ্রহের মত তার অভিপ্সিতের জন্য অপেক্ষা করছে, আবার কোথাও সমাজের বড় বড় কর্ণধারেরা পাগড়ী-চোগা, হ্যাট-কোট পরে কোন ভাগ্যবান রাজপুরুষের জন্য ব্যস্ত-সমস্তভাবে ছুটাছুটি করছেন। এক-একটী Station যেন এক-একটী জীবন্ত Picture Gallery!

ট্রেণের গাড়ীর ভিতরে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে যেমন জীবনন্ত অবস্থায় দেখা যায়, তেমন আর কোথাও দেখা যায় কি না সন্দেহ। কখনও সেখানে তার উচ্চতর প্রবৃত্তির খেলা দেখে আমাদের প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে উঠে, আবার কখনও তার নীচ-প্রবৃত্তির বিকাশ দেখে লজ্জায় আমাদের অধোবদন হ'তে হয়। মোটের উপর সেখানে যা দেখা যায়, সেটা কোন গড়া জিনিস নয়, সেটা বাস্তব জীবনই বটে।

ট্রেণের সফরের অল্প অবসরের মধ্যে অনেক সময় মানুষের সঙ্গে সুন্দর সৌহৃদ্য জমে উঠে। এক সঙ্গে দুই-এক ঘণ্টা কাটাবার পর মনে হয়, আমরা যেন আজন্মের অন্তরঙ্গ বন্ধু! কত প্রাণের কথার তখন আদান-প্রদান হয়, কত স্নেহ-সহানুভূতি দেখান হয়, কত সংকল্প করা হয়, কত প্রতিশ্রুতি নেওয়া-দেওয়া হয়! মনে হয় যেন জীবনের তরে আর একটা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ পাতান হল।

তারপর? তারপর আর কি? গাড়ী থেকে নামতে না নামতে প্রতিশ্রুতি, সঙ্কল্প সব মন থেকে কোথায় সরে পড়ে। পরে কখনও দেখা হ'লে সেই ক্ষণিকের বন্ধুটিকে ভাল করে চেনাও দুষ্কর হয়ে উঠে। বুদ্‌বুদের মতই সেই প্রণয় তখন কালের কোন্ অতলস্পর্শ গহ্বরে চিরতরে লীন হয়ে গেছে!

আমাদের জীবনের যত মিলন, যত বন্ধুত্ব, যত প্রণয় সমস্তই এই ট্রেণের বন্ধুত্বের মতই মধুর অথচ ক্ষণস্থায়ী নয় কি? দুদিনের সহবাস, দুদিনের প্রেম-পিরিতি, তার পর অনন্তের বিচ্ছেদ। দুদিন পরে প্রণয়ী প্রণয়িনীকে ছেড়ে, বন্ধু বন্ধুকে ছেড়ে এই অন্তহীন বিশ্বের কোন্ সুদূর প্রান্তে চলে যাবে, কে বলতে পারে?

পাহাড় ও প্রান্তর

Ruskin বলেছেন "To myself mountains are the beginning and the end of all natural scenery; in them, and in the forms of inferior landscape that lead to them, my affections are wholly bound up; and though I can look with happy admiration at the lowland flowers, and woods, and open skies, the happiness is tranquil and cold, like that of examining detached flowers in a conservatory or reading a pleasant book; and if this scenery be resolutely level, insisting upon the declaration of its flatness in all the detail of it, as in Holland and Lincolnshire, on central Lambardy, it appears to me like a prison, and I cannot long endure it. But the slightest rise and fall in the Road—a mossy bank at the side of a crag of chalk, with brambles at its brow overhanging it—a ripple on three or four stones in the stream by the bridge—above all, a wild bit of ferny ground under a fir or two, looking as if, possibly, one might see a hill if one got to the other side of the trees, will instantly give me intense delight, because the shadow or the hope of the hills is in them."

রাস্কিন্ স্পষ্ট বক্তা লোক, মনের কথা খুলেই বলেছেন। পাহাড় পর্ব্বত না হ'লে তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে না, সমতল ভূমিতে, মাঠে প্রান্তরে, বিস্তৃত জলাভূমিতে তিনি কোন শোভা দেখাতে পান না। এ সব তাঁর কাছে কারাগার ব'লে মনে হয়। একখণ্ড উচ্চ ভূমি, একটুখানি উঁচু-নীচু রাস্তা কিংবা ছোট্ট একটী টিপির উপর দুই চারিটী সরল গাছ (Pines) দেখলে

কিন্তু তাঁর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তিনি সে সবের শোভার মধ্যে তন্ময় হ'য়ে পড়েন।

কোন জিনিসকে পছন্দ করা না করা কতকটা ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির এবং জন্মগত রুচির উপর নির্ভর করে আর কতকটা শিক্ষা এবং সংস্কারের উপর নির্ভর করে। প্রথমোক্ত কারণের উপর যুক্তিতর্ক চলে না, তবে দ্বিতীয় কারণ বশতঃ যেখানে চিত্ত বিকৃতি জন্মে সেখানে রুচি শুদ্ধির সম্ভাবনা আছে। Ruskinএর খেয়ালের কতটা অংশ যে স্বভাবগত আর কতটা অংশ তা সংস্কারগত, যে নিয়ে তর্ক কর্‌বার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে আমার মনে হয় প্রান্তরের যে বিশেষ একটী সৌন্দর্য্য অছে, আর বিস্তৃত সমতল ভূমির যে ভাব উদ্দীপনের একটী স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেই মহাসত্যটী রাস্কিন্ অনুভব করতে পারেন নি, তা সে ত্রুটি তাঁর স্বভাবেরই হোক আর শিক্ষারই হোক।

অবশ্য পাহাড়ের সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ কি সমতল ভূমির সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ সে নিয়ে বিতণ্ডা করা বৃথা। পিঙ্গলকুন্তলা, সুনীলনয়না, গোলাপরাগরঞ্জিতা দীর্ঘাঙ্গিনী ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, কি ভ্রমরলোচনা, কৃষ্ণকেশদামশোভিতা, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব শ্যামাঙ্গিণীর সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, সে নিয়ে তর্ক করে লাভ নাই। উভয় সৌন্দর্য্যেরই একটা বিশিষ্ট কমনীয়তা, একটা নিজস্ব মধুরতা আছে। উভয় সৌন্দর্য্যই নিজ নিজ বিশেষত্বে উপভোগ্য এবং বরণীয়। তুলনায় নয়, উপভোগেই হচ্চে সৌন্দর্য্যামোদীর সার্থকতা।

পাহাড় এবং প্রান্তরের শোভার মধ্যে একটাকুলগত পার্থক্য আছে। পার্ব্বত্য শোভা মনে একপ্রকার ভাব আনে, তাব প্রান্তরের শোভা মনের মধ্যে অন্যপ্রকার ভাবের উদ্রেক করে। নিজের অনুভূতির কথা অবশ্য আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি। পাহাড়ের শোভায় আমার বাহ্যেন্দ্রিয় বিমোহিত হয়; প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। প্রান্তরের শোভায় কিন্তু আমার ভাবের উৎস

খুলে যায়। মন সসীমকে ছেড়ে অসীমের দিকে চলে যায়। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলি। সর্ব্বব্যাপী এক উদারভাব এসে আমার মনকে জুড়ে বসে।

Wordsworth বলেছেন "To me high mountains are a feeling" "আমি কিন্তু অসঙ্কোচে বলতে পারি "To me vast plains are a feeling" উন্মুক্ত প্রান্তর আর তার উপর বিস্তৃত নীলাকাশের চন্দ্রাতপ আমার মনকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আমি সেখানে জীবনের ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি কথাগুলি একেবারে ভুলে যাই; যাহা অনন্ত, যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহাই এসে প্রাণকে অধিকার করে বসে। পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য পুলকের উৎস আমার মনে অনেকবার খুলে দিয়েছে বটে, কিন্তু এ ভাবটী কখনও আনতে পারে নি। পার্ব্বত্য-শোভা আমার মনে মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়; কিন্তু প্রান্তরের শোভাসৌন্দর্য্যের অনুভূতির চেয়েও যে উপভোগ্য এবং মাদকতাপূর্ণ মনোভাব তাই, অর্থাৎ mystic feeling আমার মনের মধ্যে প্রকটিত করে তোলে। সীমাহীন প্রান্তরে মন আপন থেকেই অসীমের দিকে চলে যায়। অন্তহীন নীলাকাশে কল্পনার তরী যুক্তিতর্কের বহু দূরে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির দেশে পৌঁছায় যেখান থেকে স্বর্গরাজ্যের সোনার তোরণগুলি অতি নিকটে বলে মনে হয়!

মাঠে বন-জঙ্গল থাকলে, কিংবা আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার হলে, আত্মার এই ব্রহ্মাণ্ড বিচরণে ব্যাঘাত ঘটে। খেয়াল অনন্তের পথে কতকদূর গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ব্যথিতের বেদনায় প্রাণ ভরে উঠে। সেইজন্য বন-জঙ্গল সমাকীর্ণ প্রান্তর আমার ভাল লাগে না। আর আকাশে যে দিন মেঘের ঘটা হয় সেদিন মাঠে বেড়ান আমি পছন্দ করি না।

তবে প্রান্তরের স্থানে স্থানে দুই-চারিটী গাছ, দূরে দূরে দুই-একটী ঘর, এখানে সেখানে কর্ম্মরত কৃষকের ছোট ছোট দল, আর নীলাকাশের অন্তহীন

প্রাঙ্গণের কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমান্ মেঘের মৃদুল গতি মনের আনন্দ বিহারে বাধা জন্মায় না, বরং সাহায্য করে। সীমাবদ্ধ মানব সমাজের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য আমাদের প্রাণ অনন্তের পথে চল্‌তে চল্‌তে অন্তের দিকে এক একবার লুকিয়ে লুকিয়ে চাইতে ভালবাসে। আর সেইজন্য মন অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে ছোটখাট একটী oasis দেখিতে চায়, আর সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে একান্ত সসীম একটী কুটীর দেখলে পুলকিত হয়ে উঠে।

সকালে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে প্রান্তরের শোভা সব সময়ই উপভোগ্য। আমি কিন্তু সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটাই বিশেষভাবে উপভোগ করি। গগন প্রান্তের নিশ্চল মেঘমালার অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা, দিনমণির সমারোহপূর্ণ তিরোধান, প্রকৃতির শান্তিময় মৃদুল হাসি, পশুপক্ষীর আনন্দ কলরব, মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আর প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি এনে দেয়। মস্তক ভক্তিভরে আপনি প্রণত হয়ে পড়ে, অন্তরে অর্চ্চনাধ্বনি আপন থেকেই গুঞ্জিত হতে থাকে।

সমতল ভূমির আর একটী শোভা আমার বড় ভাল লাগে, সেটা হচ্ছে নদী কিংবা তড়াগের উপর বৃষ্টির মুষলধারে বর্ষণ। সাহিত্যে যেমন নানাবিধ রস আছে, প্রকৃতিও তেমনি রসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিস্তৃত প্রান্তরে যেমন স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে mystic feelingএর আবির্ভাব হয়, কৃষ্ণকাদম্বিনী-সমাকীর্ণ আকাশের নদীর উপর মুষলধারে বারি বর্ষণ তেমনি মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা, একটা বিষাদের আমেজ (tone) এনে দেয়। মনে হয় যেন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে কোন শ্রেষ্ঠ কবি রচিত এক Tragedyর অভিনয় দেখ্‌ছি। প্রাণের মধ্যে তখন বিষাদের কত তরঙ্গ উঠে, দুঃখের কত পুরাতন কাহিনী আবার মনে পড়ে, বিরহের কত সুপ্ত যাতনা এসে অন্তরকে চঞ্চল করে তুলে।

সমতল ভূমির সৌন্দর্য্য কেবল প্রান্তর আর জলাশয়ের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। ছোট্ট একটী ঝোপের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী পাখীর বাসা কি মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে না? গ্রামের প্রান্তে শিমুল গাছটী সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় নিয়ে কি

দাঁড়িয়ে থাকে না? বট গাছের পাখীর কলরব কি মনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগায় না?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক অভিব্যক্তির মধ্যে আকাশের নীলিমা, মেঘমণ্ডলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, সমীরণের বিভিন্ন গতি, জনপ্রাণীর জীবনলীলা, লতাপল্লবের মধুর হাসি, ফুলের সৌরভ, প্রভৃতি সমস্ত নৈসর্গিক উপকরণই তাদের বিশিষ্ট অংশ নিয়ে থাকে। আর এই সব বিভিন্ন উপকরণের বিভিন্ন সংযোগে প্রকৃতি আমাদের জন্য নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকেন।

সৌন্দর্য্য পাহাড়ে, প্রান্তরে, পর্ব্বত শিখরে, বিস্তৃত সমতল ভূমিতে, আমাদের আশে পাশে চারিদিকে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। দারিদ্র্য প্রকৃতিতে নাই, দারিদ্র্য আছে আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বে দীক্ষিত করতে পারলে, আর তার সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে দেখতে পাব, আমরা অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত এক রম্য কাননে বাস করছি, যার প্রত্যেক গাছের মধ্যে আর প্রত্যেক পাতার মধ্যে ভাবের অনন্ত উৎস প্রচ্ছন্ন রয়েছে; সেই উৎস তখন আমাদের দীক্ষিত আত্মার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নেচে উঠবে, আর আমাদের মন-প্রাণকে পুলকে অভিসিক্ত করবে।

সাধনার লক্ষ্য

দেহে গ্লানি এলে শরীরে রোগ দেখা দেয়। রাষ্ট্রে গ্লানি এলে দেশে অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখা দেয়। আর ধর্ম্মে গ্লানি এলে ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে দেখা দেয় অনাচার এবং স্বেচ্ছাচার, নীতির লাঞ্ছনা, পাপের তাণ্ডব নৃত্য।

ধর্ম্মের গ্লানি আসে কোথা থেকে ?

মানুষ যখন ধর্ম্মের চিরন্তন উৎস তার অন্তরকে ছেড়ে আচার এবং অনুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, অন্তরের নির্দ্দেশকে অবহেলা করে গ্রন্থের আক্ষরিক এবং বৈয়াকরণিক অর্থের আলোচনায় মেতে যায়, তখনই ধর্ম্মে আসে গ্লানি। মানুষকে বারবার এই সব বাইরের জিনিসকে ছেড়ে নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হবে—কেননা মানুষের অন্তরই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির, দিব্য জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তবে একথা ভুললেও চলবে না যে, মানুষের অন্তরেও গ্লানি আসে, দূষিত আবহাওয়ার প্রভাবে, কদর্য্য পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। এই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় কি ?

প্রথমতঃ তাঁর শরণাপন্ন আমাদের হতে হবে, যিনি হলেন সর্ব্বমঙ্গলের উৎস। তদ্‌গত প্রাণ হয়ে তাঁর কাছে আত্ম নিবেদন করতে হবে। আমাদের ডাকে যদি আন্তরিকতা থাকে, তিনি সে ডাকে তা হলে সাড়া দিবেন।

তারপর প্রকৃত মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী, তাঁদের জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে পড়া দরকার। ছোট্ট একটী ছবিতে মানুষ যেমন মহাসমুদ্রের রূপ দেখতে পায়, মহাপুরুষের সামান্য একটী কথার মধ্যেও সে চিরন্তন সত্যের সন্ধান পায়। তবে প্রকৃত ফল পেতে হলে ভক্তি নিবেদিত মনে পড়া দরকার। যা দুর্ব্বোধ্য, ভক্তি তাকে সহজবোধ্য করে দেবে, যা অবিশ্বাস্য, ভক্তি তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে দেবে।

সাধন মার্গে গুরুর বা পীরের বিশিষ্ট একটা স্থান আছে। সাধনার গোড়ার দিকে ভক্ত প্রকৃত পথ সহজে খুঁজে পায় না। বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। সে সময় যদি জ্ঞানী গুরুর সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য তার হয়, তা হলে পথচলা তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে

চিরকাল যেমন স্কুলে কাটান যায় না, গুরু গৃহেও তেমনি চিরকাল কাটান যায় না।

গুরুর কাছে থেকে পথের তথ্য লাভ করে ভক্তকে নিজের উপর নির্ভর করেই শেষে চলতে হবে। সে শক্তি যখন সে লাভ করবে, তখনই সাধনা তার প্রকৃত স্বার্থকতার পথে অগ্রসর হবে।

গাছের দুটী পাতা কখনও একই আকারের একই প্রকারের হয় না। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় দুটী মানুষ ঠিক একই ধরণের কখনও হয় না, হতেও পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্টকে মানুষ যখন ফুটিয়ে তোলে, তখনই তার জীবন স্বার্থক হয়। ভগবান এইটেরই তার কাছ থেকে আশা করেন। সাধনার লক্ষ্য হল নিজের বিশিষ্ট আত্মার সম্যক বিকাশ, আর সাধনার পথ হল আত্মবিকাশের পথ।

বাক্যালাপ

What would you not give to have an hour's frank talk with Shakespeare—if Shakespeare were now living? You cannot think of yourself so poorly as not to feel sure that at the end of the hour, you would have got something out of him which fifty years' study would not suffice to let you get out of his play.

* * * * *

If the whole be greater than a part, a whole man must be greater than that part of him which is found in a book.

Lord Lytton in "Caxtoviana."

সত্যই মানুষের সঙ্গে একবার প্রাণ খুলে আলাপ করে যা পাওয়া যায়, তা তার বই পড়ে কিংবা তার সঙ্গে পত্রালাপ করে কখনও পাওয়া যায় না। মানুষের অন্তর যেমন তার মুখের ভঙ্গিমায়, তার স্বরের তারতম্যে, তার চোখের আভায় প্রকাশ পায়, তেমন আর কিছুতে প্রকাশ পায় না। বইয়েতে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানুষের ভাগ করা, পৃথক-করা একটা অংশ মাত্র। বাক্যালাপে কিন্তু গোটা সেই মানুষটিকেই পাই; আর সে মানুষ তার পুস্তকে প্রকাশিত অংশের চেয়ে অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক রহস্যময়।

মানুষের মত মানুষের সঙ্গে বিরলে প্রাণ খুলে আলাপ করার মত বিমল আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই আলাপ যদি দুটী kindred spirits (একভাবাপন্ন প্রাণ) এর মধ্যে হয়, তাহলে উভয়েই তাতে সমান আনন্দ পেয়ে থাকে, আর এই আলাপে উভয়েই এমন সব সমুজ্জল সত্যের সন্ধান পায়, যা তারা হয়তো কখনো কল্পনাও করেনি!

আমাদের এই এলোমেলো দেশে বাক্যালাপও একটা এলোমেলো, আকার-প্রকারহীন জিনিষের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। বাক্যালাপ যে একটী অতিসূক্ষ্ম, অতিসুন্দর, এবং অতি Delicate আর্ট, তা আমরা এখনও ভাল করে বুঝতে শিখিনি। তাই আমাদের বাক্যালাপের মধ্যে কোন শিল্প, কোন সৌন্দর্য্য কোন বিশেষত্ব নাই। খানা-ডোবায়-পড়া বর্ষার জলের মত সেটা পঙ্কিল উচ্ছ্বাসে, কদর্য্য গতিতে ঠাঁই-বেঠাঁই-এর বিচার না করে তার ছন্দহীন বর্ষার গান গেয়ে চলে যায়। সুর এবং সৌন্দর্য্য তাতে মাঝে মাঝে দেখা দেয় বটে, কিন্তু তারা কোন শিল্প-নিয়মের অনুবর্ত্তন করে না। সেই সুরের সঙ্গে discord (বেসুর), সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কদর্য্যতা মেশানো থাকে। সে সুরকে এস্রাজের সুনিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারও বলা চলে না, আর সে সৌন্দর্য্যকেশিল্পীর সৃষ্টিও সাধের বলতে পারি না।

বাক্যালাপের আর্টটা কিন্তু একেবারেই এ রকমের নয়। পার্ব্বত্য উপবনের

মধুরভাষিণী নির্ঝরিণীর মত সে কুলুকুলু তানে নাচতে নাচতে চলে যায়। কখনো বা সে ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবার কখনো বা স্নিগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মিষ্টালাপ করতে করতে ধীর মন্থরগতিতে চলতে থাকে। উভয়েরই গতির মধ্যে একটা আবেগ, একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা উদ্দেশ্য, একটা উত্তেজনা তীব্র অথচ সংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রকৃত বাক্যালাপে তুই আলাপীর প্রাণের মধ্যে গভীর একটি মিল থাকা চাই, অথচ তাদের চিন্তার ধারা হবে বিভিন্ন প্রকৃতির। মূলগত মিল না থাকলে আলাপ কলহে পর্য্যবসিত হবে, আর চিন্তার ধারা একেবারে অভিন্ন হলে সে একমতেরই পুনরাবৃত্তি হবে, আলাপ হবে না। আলাপীদের মনের unity in diversity আর diversity in unityই হচ্ছে আলাপের প্রধান উপকরণ। তুই বন্ধু যখন একই গন্তব্যে মিলিত হবার জন্য তুই বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রতিযোগিতা করে চলতে থাকে, তখন তাদের মনে যে আনন্দ, যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই হচ্ছে বাক্যালাপের প্রকৃত রস।

ইচ্ছা করলেই কিন্তু প্রকৃত বাক্যালাপী হওয়া যায় না। তার জন্য প্রতিভা আর সাধনা তু'য়েরই দরকার। আলাপীর প্রাণে ভাবের একটা স্বচ্ছন্দ খেলা চলা চাই, আর সেই খেলাকে মূর্ত্তি দেবার ক্ষমতাও আলাপীর ভাষায় থাকা চাই। মোট কথা, যে-গুণে কারও লেখা রচনা পড়বার যোগ্য হয়, ঠিক সেই গুণেই তার কথাও শোনবার যোগ্য হয়। তুইয়েরই মধ্যে কৌতুকের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য, আনন্দের সঙ্গে বিষাদ, তুচ্ছের সঙ্গে মহান ভাব এক অপূর্ব্ব শৈল্পিক অনুক্রমে প্রকাশ পায়, আর রসিকের মনকে অপূর্ব্ব রসে সিক্ত করে।

বাঙলার চেয়ে আমি ইংরাজীতেই বাক্যালাপ পছন্দ করি। তার কারণ, সাহিত্যিক এবং কথিত ভাষার বিচ্ছেদ আমাদের প্রকৃতই মস্ত একটা তুর্ভাগ্য। আমাদের সাহিত্যিক ভাষা মুখে বেখাপ্পা শোনায়; অথচ কথিত ভাষায় মনের সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক ভাবগুলিকে প্রকাশ করা তুরূহ।

প্রকৃত বাক্যালাপ দু'জনের মধ্যেই সম্ভব। তৃতীয় ব্যক্তি আলাপে যোগ দিলে মনের গতি ব্যাহত হয়, আলাপ তার Logical পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়, এবং ভাবের তরঙ্গ পূর্ণতা লাভ না করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

অনেকে ঘরে বসে আরামে আলাপ করতে ভালবাসেন, আবার কেউ কেউ পাদচারণের সঙ্গে আলাপ করাটাই বেশী পছন্দ করেন। এটা মানুষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমি এই শেষোক্ত ধরণের বাক্যালাপই বেশী উপভোগ করি। যতগুলি বাক্যালাপের রেখা আমার মনে গভীরভাবে আঁকা আছে, তাদের অধিকাংশ এই পাদচারণের সঙ্গেই ঘটেছে। প্রকৃতির সুন্দর বিজন পথে চল্‌তে চল্‌তে মনের কথা যেমন অনায়াসে খুলে বলেছি, ঘরে বসে তেমন কখনও পারিনি। শরীরের গতি আর নিসর্গের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য আমার চিন্তা আর কল্পনাকে যেমন উত্তেজিত করেছে, ঘরের সুস্থির গতিহীন (Stationary) আবহাওয়া তেমন করেনি। অনেকের পক্ষে কিন্তু এই শরীরের গতি আবার কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে অবশ্য ঘরের বাইরে আলাপের চেষ্টা করা ভুল।

আলাপে অন্তরের গভীরতম অনুভূতিগুলি তখনই প্রকাশ পায়, যখন তার প্রবাহ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে চলতে জীবনের কোনো গুরুতর সমস্যার তীরে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। সেই প্রবাহের মধ্যে আমাদের অন্তরের ভাবগুলি নদী-বক্ষে কমল-দলের মতই অনায়াসে ফুটে ওঠে। আগে থেকে তোয়ের হয়ে বাক্যালাপ সুরু করলে কিন্তু এমন হয় না; দায়িত্বজ্ঞান তখন আত্মপ্রকাশের পথে বিষম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আলাপের সফলতা সেই জন্য অনেকটা chanceএর উপর নির্ভর করে। তবে দু'জনের মনই যদি ভাবে ভরপুর থাকে, আর দুশ্চিন্তার কীট যদি সেই মনকে দংশন না করে, এবং ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাবার প্রয়োজনীয়তা যদি না ঘটে, তাহলে আলাপ ছোট-খাট জিনিষ থেকে সুরু হলেও অবাধে ভাবের এবং কল্পনার সমুচ্চ শিখরে উঠে পড়ে। তখন বড়

বড় সমস্যা আপনা থেকেই আসতে থাকে, আর তাদের সুচারু সমাধানও সহজে আপনা-আপনি হয়ে যায়।

আলাপ একবার বিশেষ একটা পথ নিলে, তাকে সেই পথেই চালাতে হয়; তা না হলে মন তার স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে ফেলে। সেইজন্য অবান্তর কথা যাতে আলাপের কোনো ফাঁকে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার।

সত্য—শিব—সুন্দরের অনুসন্ধানে দুই ভাবুক প্রাণের একত্রাভিযানের নামই হচ্ছে বাক্যালাপ। তার সাফল্যের জন্য দরকার—ত্যাগ, ধৈর্য্য, সংযম এবং সহানুভূতি। এমন অনেক লোক আছে, যারা পরের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনতে Constitutionally অক্ষম; নিজের মত ব্যক্ত করবার জন্য তারা সর্ব্বক্ষণ ছট্‌ফট করতে থাকে, তোমার কথা তোমার মুখে থাকতে থাকতেই তারা তাদের দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করে দেয়, আর তুমি বেচারা কিছু বল্‌ছো কিনা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।

আবার এক রকম লোক আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ একান্ত উৎসুক। তোমার মতটুকু যে ভ্রান্ত আর যথার্থ সাতটী যে তারই অধিগত, এর প্রমাণের জন্য তারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে ছাড়ে না। এসব লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে কোন, লাভ নাই! তাদের সামনে চুপ থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, নচেৎ আলাপ প্রলাপে পরিণত , হবে। দরদ আর সহানুভূতিই হচ্ছে বাক্যালাপের প্রাণ। এই দরদ আর সহানুভূতির সোনার ডোরেই বাক্যালাপের রঙীন্ ঘুড়ি স্বচ্ছন্দগতিতে ভাবের আকাশে উড়তে থাকে। Appreciation-এর দখিনা বাতাস দিয়ে সেই ঘুড়িকে নাচাতে হয়। যদি তা করতে পারো, তা'হলে তুমি সেই ঘুড়ির বিচিত্র গতি আর প্রাণ-মাতানো নাচ দেখে মুগ্ধ হবে, আর মনে মনে বলবে, "এমন ঘুড়ি যদি রোজ ওড়াতে পারি, তা' হ'লে কি মজাই হয়!"

আলাপ তাদেরই শোনবার মত হয়—যাদের মনের ভাবের অবিরাম একটা খেলা চলতে থাকে। Eloquence তাদের কথায় আপনা থেকেই এসে পড়ে, আর তাদের earnestness (নিষ্ঠা) তাদের কথার মধ্যে এমন প্রাণের সঞ্চার করে যে, তাতে আর অলঙ্কারের কোনো দরকার হয় না। তাদের আলাপে আমরা এমন সব সত্যের সন্ধান পাই, যা কোন নীরস শুক্‌নো ছাপার কেতাবে পাওয়া যায় না। আলাপীর মুখের কথার সঙ্গে তার ছাপানো কেতাবের তুলনা করে তাঁর মনের তুলনায় পুস্তকের দৈন্য দেখে অবাক্ হয়ে যাই। তখন মনে হয়, মানুষ যত বড় জিনিষই সৃষ্টি করুক না কেন, সে তাঁর সে সৃষ্টির চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক গভীর, অনেক বেশী ধনে ধনী।

Bulwar Lytton তাঁর এইরূপ একটা অনুভূতির বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে সেটুকু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলুম না। তিনি বলেছেন—"I remember being told by a personage who was both a very popular writer and a very brilliant conversor, that the poet Campbell reminded him of Goldsmith—his conversation was so inferior to his fame. I cannot deny it for I had often met Campbell in general Society, and his talk had disappointed me. Three days afterwards Campbell asked me to come and sup with him tate a-tate I did so. I went to ten O'clock, stayed till dawn, and all my recollections of the most sparkling talk I have ever heard in drawing rooms afford nothing to equal the riotous affluence of wit, of humour, of fancy, of genius, that the great lyrist poured forth in his wonderous monologue—monologue it was; he had it all to himself.

Lytton জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাই Campbellকে স্রোতে তাঁর প্রাণটাকে

ঢালতে দিয়েছিলেন। আর কেউ হলে হয়তো তর্ক জুড়ে দিত এবং কবিও তাহলে শামুকের মত তাঁর অন্তরের মধ্যে ঢুকে চুপটী করে বসে থাকতেন!

আলাপের ধর্ম্মই হচ্ছে পরকে বল্‌তে দেওয়া, এবং সময় ও সুযোগ পেলে তবে আত্ম-প্রকাশ করা। নিজের চেয়ে বড়লোকের সঙ্গে আলাপের সময় শ্রোতা হওয়াই ভালো। সেখানে বক্তা হবার চেষ্টা করলে জীবনের একটা অমূল্য সুযোগ হারাতে হয়। অবশ্য সময় বুঝে আত্ম-প্রকাশও করতে হয়; তবে সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করা দরকার, আর সে সময় না আসা পর্য্যন্ত অপরকে বলতে দেওয়াই হচ্ছে আলাপীর প্রকৃত ধর্ম্ম।

প্রকৃত একজন ভাবুকের সঙ্গে প্রাণ খুলে একবার আলাপ করলে মনটা যেমন ঝরঝরে হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতে হয় না। ভ্রান্তির কুজ্ঝটিকা দূরে সরে যায়, মুখ থেকে মিথ্যার মুখোস খসে পড়ে এবং তখন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাই।

অজেয় সোনালী ঈগল

পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী!

এক দিকে তার উঁচু পাহাড়—পাইন গাছে ভরা। অপর দিকে বিস্তীর্ণ উপত্যকা—শস্যক্ষেত্রের হরিৎ শোভা। তারপর পাহাড়ের গায়ে গ্রামবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান-পরিবেষ্টিত কুটিরশ্রেণী এবং গির্জ্জা, বিদ্যালয়, ক্লাব, পানশালা প্রভৃতি সামবায়িক প্রতিষ্ঠানাদি সুন্দর ছবির মত সাজান রয়েছে!

অপরাহ্ন বেলা। নীল আকাশের একচ্ছত্র সম্রাট সূর্য্যদেব বিশ্রামের জন্য

মহাসমারোহে অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শ্বেতবর্ণের বালক-বালিকারা মনের আনন্দে মাঠে খেলা করছে। প্রবীণেরা গাছের তলে বেঞ্চে বসে তাদের খেলা দেখছে। শ্বেত ঔপনিবেশিকদের এ হচ্ছে নূতন এক আস্তানা।

দূর পার্ব্বত্য দেশ থেকে এক লাল ইণ্ডিয়ান যুবক নদীর অপর পারের পাহাড়ের একটী পাইন গাছের ছায়ায় এসে বসল। মস্তকে তার ঈগল পাখীর পালকের শিরস্ত্রাণ শোভা পাচ্ছে। নাম তার অজেয় সোনালী ঈগল। ঈগল পাখীর মতই তার মেদবর্জ্জিত মুখমণ্ডল, ঈগল পাখীর মতই তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সুদূরপ্রসারী, ঈগল পাখীর মতই ত্বরিত তার গতি, ঈগল পাখীর মতই অব্যর্থ তার লক্ষ্য, ঈগল পাখীর মতই দেহে তার শক্তি আর ঈগল পাখীর মতই অদম্য তার সাহস। হাতে তার প্রকাণ্ড একটা ধনুক, আর কটিদেশে তার ঝুলছে তীর রাখবার বাঁশের একটী তূণ।

গাছের ছায়ায় এসে সে বসল যেমন ক'রে শিকারী বসে ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষায় দেহমন আক্রমণের জন্য উদ্যত। চোখের সামনে তার ঔপনিবেশিকদের— আনন্দ-কোলাহল চলেছে। কেউ নাচছে, কেউ খেলছে, কেউ হাসছে, কেউ গাইছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তার স্বজাতীয়েরাই এখানে নাচতো, হাসতো আর গাইতো। এখন তারা কোথায়?

লাল ইণ্ডিয়ান যোদ্ধার মন চলে গেল সুদূর সেই অতীতের জগতে! শ্বেত ঔপনিবেশিক এ গ্রামে তখন কেউ ছিল না। তার পিতামহ রূপালী ঈগল ছিলেন তখন এদেশের রাজা, আর তার পিতা ছিলেন যুবরাজ। সে তখন ক্ষুদ্র শিশু। তখনকার আনন্দময় জীবনের ছবি ধীরে ধীরে তার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো, অস্পষ্টভাবে, পুরাতন এক চলচ্চিত্রের ফিল্মের মত!

সে তার পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে এই মাঠেই কত খেলা করেছে! তার যুদ্ধকুশল পিতামহ মাথায় পালকের শিরস্ত্রাণ এঁটে বর্শা-হাতে গ্রামের প্রবীণদের সঙ্গে বসে ছেলেদের খেলা কতবার দেখেছেন। তার শরীরের শক্তি আর মনের

সাহস দেখে কতবার তিনি সগর্ব্বে হাততালি দিয়েছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার বিষয়ে কত বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন! তার মা কতবার সাদরে তার মুখচুম্বন করতে করতে বলেছেন, "তুমি হলে বাবা আমার অজেয় সোনালী ঈগল! সব রাজাদের হারিয়ে তুমি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করবে যেমন সাম্রাজ্য একদিন মেক্‌সিকোতে ছিল, মেরুতে ছিল।"

ফিল্ম ঘুরতে লাগলো। দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হতে লাগলো। শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকেরা এল দলে দলে। হাতে তাদের লম্বা লম্বা চোং। পিতামহ রূপালী ঈগল বর্শা হস্তে গ্রামের যোদ্ধাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন শত্রুকে বাধা দিতে। তার স্বজাতীয়েরা লড়লো বীরবিক্রমে যেমন ক'রে সিংহ যুদ্ধ করে বন্দুকধারী মানুষের সঙ্গে। আগুনের চোং-এর সামনে বর্শা এবং ধনুর্ব্বাণ কিন্তু হার মানলো। তার পিতামহ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে জানতেন না। সিংহের বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করলেন। গ্রামের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হলেন। দু চার্‌জন যোদ্ধা বনে পালিয়ে গেল। শ্বেত ঔপনিবেশিকদের জয় হল।

সোনালী ঈগলের মা আর বৃদ্ধা পিতামহী তাকে নিয়ে দূর জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। তারপর তাদের দিন অতি কষ্টেই কেটেছে। গভীর দুঃখে পিতামহী অল্পদিনের মধ্যে গতাসু হলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তার মাও স্বর্গে চলে গিয়েছেন। এখন সে একা! আপনজন বলতে এ পৃথিবীতে কেউ তার নাই। রাজ্য গিয়েছে, সাম্রাজ্যের স্বপ্ন গিয়েছে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনুচর-সহচর সবই তার চলে গিয়েছে। এখন সে একজন বন্য শিকারী! বনে বনে পশু-পক্ষী শিকার করে বেড়ানই হল এখন তার কাজ।

অজেয় সোনালী ঈগল তার নাম। সোনালী ঈগলের মতই নির্ভীক তার অন্তর। সোনালী ঈগলের মতই তীক্ষ্ণ সুদূর-প্রসারী তার দৃষ্টি। সোনালী ঈগলের মতই অব্যর্থ তার লক্ষ্য। মনের অলক্ষিতে এক হাত তার ধনুকটাকে

চেপে ধরলে, আর অন্য হাতটা তীক্ষ্ণধার এক তীর তূণ থেকে বার করলে। ধনুকে তীর সংযোগ করতে গিয়ে কিন্তু তার স্বপ্নের মোহ গেল ভেঙ্গে।

আগুনের চোং-ধারী শত শত শ্বেত ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ফল পাওয়া যাবে? নিরীহ কতকগুলো ছেলে মেয়েকে হত্যা করা কি উচিৎ? উদ্দেশ্যহীন হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার কি কোন সার্থকতা আছে?

অজেয় সোনালী ঈগল যেমন সোনালী ঈগলের মতই ত্বরিত গতিতে চিন্তা করতে পারতো, তেমনি ত্বরিত গতিতে সে সঙ্কল্প আঁটতেও পারতো। এ ক্ষেত্রেও সঙ্কল্প আঁটতে তার বেগ পেতে হল না।

নদীতে ঝপ্ করে বড় একটা একটা কিছু পড়ার শব্দ হয়েছিল। খেলায় রত ছেলেমেয়েরা সে শব্দ লক্ষ্য করেনি। নদীর জল ক্ষণিকের তরে আন্দোলিত হয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যই। মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে' নির্ব্বিকার চিত্তে নদী সাগরের পথে চলেছিল, বড় লোকেরা যেমন করে গরীবের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না করে, তাঁদের সুমহান উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হন।

শীতের সময় নদী যখন প্রায় শুষ্ক, গ্রামের ছেলেরা পাহাড়ে পাখীর ডিমের সন্ধানে এসে মস্ত বড় একটা রহস্য আবিষ্কার করলে নদীগর্ভে প্রকাণ্ড এক নরকঙ্কাল—তার এক হাতের আঙ্গুলের হাড়গুলো প্রকাণ্ড একটা ধনুককে আঁকড়ে ধরে ছিল, আর অন্য হাতের আঙ্গুলের হাড়গুলো আঁকড়ে ধরে ছিল একটা তীরকে। কঙ্কালের আঙ্গুলের হাড়গুলি ধনুক এবং তীরকে এমন ভাবে ধরেছিল যে, দেখলে মনে হত, যে কোন মুহূর্ত্তে সেই কঙ্কাল উঠে দাঁড়াতে পারে, এবং ধনুকে তীর যোজনা করে' শত্রুর উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করতে পারে।

অজেয় সোনালী ঈগল বুঝি মৃত্যুকেও জয় করেছিল।

বোকামীর চূড়ান্ত

বার বৎসর পর পুরাতন এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বন্ধুর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল; দেখলুম মনের দুঃখে তিনি একান্ত ম্রিয়মান। দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। বন্ধু বললেন "আমার বুদ্ধি জেগেছে, পঞ্চাশের পর, তাই এই দুঃখ।"

আমি বললুম "এক যুগ পরে আমাদের সাক্ষাৎ। হেঁয়ালী এখন ছাড়, কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল।"

বন্ধু বললেন "এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট করে বলব। সত্যি বলছি, আমার বুদ্ধি জেগেছে, তাই এই দুঃখ।"

আমি বললুম "তার মানে?"

বন্ধু বললেন "যতদিন বুদ্ধি জাগেনি, ততদিন কাজ করতে পারতুম। অবশ্য অনেকে আমায় ঠকাতো, অনেকে আমায় বোকা বানাতো। তবে মোটের উপর লোকসানের চেয়ে লাভই আমার বেশী হত। আর মধ্যে মধ্যে বোকা বনলেও মোটের উপর কিছু আমি করে ফেলতুম। আর তার ফলেই এত দূর উঠেছি। এখন কেউ এলেই বুঝতে পারি, সে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে। সুতরাং তাকে তাড়িয়ে দিই। লোকে যখন এসে আমার প্রশংসা করে, আমার নেতৃত্বে কিছু করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তারা যে বোকা বানিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবার চেষ্টায় আছে, সেটা বুঝতে আমার দেরী হয় না। তাদেরও আমি তাড়িয়ে দিই। কেউ আমাকে আর ঠকাতে পারে না, কেউ আমাকে আর বোকা বানাতে পারে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও তারা আর সাহস করে না। আমি আর ঠকি না বটে, কিন্তু এখন এক নিষ্ক্রিয় জড়ভরতে পরিণত হয়েছি। কিছুই করি না। ভালও না, মন্দও

না। যে গুণের জন্য আমার খ্যাতি ছিল, কাজ কয়বার আমার ক্ষমতা ছিল, সে গুণ এখন লুপ্ত হয়েছে।"

আমি বললুম "সেই পুরাতন জীবনে আবার তাহলে ফিরে যাও। আবার ঠক, আবার বোকা বন।"

বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন "তাই করব ভাবছি। অতি চালাক হওয়াটাই হল বোকামীর চূড়ান্ত অবস্থা।"

মসজিদ

পাঠক, আপনি দিল্লীর জুম্মা মসজিদের কথা অবশ্যই শুনেছেন। কি সুন্দর তার গঠন, কি অপরূপ তার স্থাপত্য কৌশল! লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে তার সৌন্দর্য্য দেখতে, তার মনোহারিত্ব উপলব্ধি করতে!

কনষ্টাণ্টিনোপলের সুফিয়া মসজিদের কথাও অবশ্য আপনি শুনেছেন। এক সময় এই মসজিদ ছিল খৃষ্টানদের গির্জ্জা—Santa Sophia! বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ এই গির্জ্জাকে বানালেন ইস্‌লামের উপাসনালয়—খৃষ্টানের ধর্ম্ম বিজয়ী সুলতানের ধর্ম্মের কাছে হার মেনেছে—সুতরাং খৃষ্টানের গির্জ্জা, হ'ল মুসলমানের মসজিদ। এখন আবার বিশ্ববিশ্রুত মসজিদ হয়েছে মিউজিয়াম—কামাল আতা তুর্কের সময় থেকে, কেন না এখন ধর্ম্ম হার মেনেছে বিজ্ঞানের কাছে।

এই রকম আরও কত বড় বড় মসজিদ আছে। কি অপরূপ তাদের স্থাপত্য, কি সুন্দর তাদের গঠন, ভক্তমণ্ডলীর কত প্রিয় তারা!

এই সব মসজিদের নাম শুন্‌লে আমাদেরও মনে ভক্তির হিল্লোল উঠে, এদের দেখবার জন্য আমাদের মনে অদম্য কৌতূহল জাগে। এ সব মসজিদ যাঁরা বানিয়েছেন, তাদের কীর্ত্তিকলাপের কথা ভেবে বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হই। মানুষের ভগবৎপ্রীতির এ সব হ'ল এক-একটী জ্বলন্ত নিদর্শন। অশেষ যত্ন, অফুরন্ত ধনরত্ন খরচ ক'রে মানুষ এই সব ইমারত বানিয়েছে নিরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উপযুক্ত বেষ্টনীর সৃষ্টি করবার জন্যে। ধন্য তাদের ভক্তি, ধন্য তাদের সাধনা, ধন্য তাদের কামনা! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে তাদের কীর্ত্তিকলাপ লেখা থাক্‌বে চিরকালের জন্য। সহৃদয় পাঠক, এ দীন লেখকের না আছে ধন, না আছে দৌলৎ, না আছে জনবল, না আছে শক্তি। তবে আমিও তো একটা মানুষ বটে! আমিও তো খোদাকে ভালবাসি। খোদার উপযোগী একটা উপাসনার ঘর বানানার একটা দুরাশা আমিও তো অন্তরের গুপ্তদেশে পোষণ করি! তাই প্রকৃত মানুষের মত এ কার্য্যে আমিও হাত দিয়েছি। খোদার উপযোগী এক মসজিদ আমিও প্রস্তুত করছি! একটু একটু ক'রে সে কার্য্য করছি বটে, কিন্তু নিত্যই করছি। আমার এই বিচিত্র প্রয়াসের কথাই আপনাকে এখন বলি। দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস আমার নাই। আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেই আমার কাহিনী আমি বল্‌ব। তবে বলা দরকার। আমি না বল্‌লে, কেউ হয় তো আর বলবেন না। ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা অলিখিতই থেকে যাবে!

পাঠক হয় তো, এদিক্‌-ওদিক্‌ চাইবেন, কোথায় সে মসজিদ দেখবার জন্যে! আমি জানি আপনাকে নিরাশ হতে হবে। চর্ম্মচক্ষে সে মসজিদ দেখা যায় না। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করবেন? তাতেও কোন ফল হবে না। সে মসজিদের 'সিসেম ফাঁক' আমারই হাতে। আমি চাবি না খুললে সে মসজিদে আপনি ঢুকতে পারবেন না। যাদুর মসজিদ—যাদুকরের হাতেই তার চাবি। সুতরাং

বেশী বাক্যব্যয় না করে, খোদার নাম নিয়ে 'সিসেম ফাঁক' বলি; আপনিও বাক্যব্যয় না করে আমার অদৃশ্য যাদুর মসজিদে প্রবেশ করুন।

কি দেখ্‌তে পেলেন? আপনি বল্‌লেন, কিছুই নয়। আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন নাকি? পরিহাস করছি না, তবে যাদুকর না বলে দিলে এ মসজিদের রহস্য আপনি বুঝবেন না।

শুনুন তবে।

আমার এই মসজিদ বিরাজ করে আমার অন্তরে। চর্ম্ম চক্ষু দিয়ে একে দেখা যায় না, একে দেখতে হয় অন্তরের চক্ষু দিয়ে। গোড়ায় যে সব মসজিদের কথা বলেছি তাদের নির্দ্দিষ্ট একটা দাম আছে, সেইখানেই তারা বিরাজ করে—অবশ্য সগৌরবে। আমার এই মায়ার মসজিদ কিন্তু হ'ল বিশ্বব্যাপী এ মসজিদের চূড়াটি নীহারিকাকেও অতিক্রম করে যায়। আর এর বনেদ পাতালকেও ভেদ করে যায়।

গোড়ায় যে সব মসজিদের কথা বলেছি, তাদের দেওয়ালের উচ্চতার প্রশংসায় দর্শকেরা পঞ্চ মুখ হন। আমার মসজিদের দেওয়ালের পরিসরের কথা শুন্‌লে, কিন্তু তারা বিস্ময় প্রকাশের ভাষাও হারিয়ে ফেলবেন! দিগ্‌মণ্ডলের এক একটী দিক্ হচ্ছে আমার মসজিদের এক একটী দেওয়াল। এক কথায় আমার এই মসজিদ বিরাট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করে আছে।

আমার মসজিদের আকার প্রকারের কথা তো কতকটা বল্‌লুম। এখন এর ভক্তমণ্ডলীর কথা কিছুও বলা যাক।

গোড়ায় যে সব বড় বড় মসজিদের কথা বলেছি, সেখানে প্রার্থনা করতে যান কারা? বড় নবাব সুবোরা যান, বড় বড় জমিদার, যান, বড় বড় ব্যবসায়ীরা যান, তারপর গরীব দুঃখীরা তো আছেই, তবে সকলেই তাঁরা মুসলমান। মুসলমানের মসজিদে মুসলমান ছাড়া অন্যের স্থান নাই। অন্যে যদি খোদার কাছে প্রার্থনা করতে চায়, তা' হলে তারা তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে করুক। খৃষ্টান তার

গির্জ্জায় গিয়ে করুক এহুদি তার সিনেগগে (Synagogue) গিয়ে করুক, পারসিক তার অগ্নিমন্দিরে গিয়ে করুক, হিন্দু তার দেবালয়ে গিয়ে করুক, বৌদ্ধ তার মন্দিরে গিয়ে করুক।

আমার মসজিদে কিন্তু এ সব বাচ-বিচার নেই। এ মসজিদে প্রার্থনা করতে সব জাতিই আসে। মুসলমানও আসে, আর খৃষ্টানও আসে, এহুদিও আসে, আর পারসিকও আছে, হিন্দুও আসে আর বৌদ্ধও আসে। এ মসজিদে প্রবেশ করবার অবাধ অধিকার প্রত্যেক মানব সন্তানেরই আছে।

গোড়ায় যে সব মসজিদের কথা বলেছি, সে সবে প্রবেশ করতে হ'লে বিধিমত অঙ্গ পরিশুদ্ধি করে, নির্দ্দিষ্ট ধরণের কাপড় চোপড় পরে তবে প্রবেশ করতে হয়। আমার মসজিদে প্রবেশ করার বিষয়ে কিন্তু সে রকম বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন নাই। শুদ্ধ দেহ আর অশুদ্ধ দেহ, নির্দ্দিষ্ট ধরণের পোষাক পরা, আর অনির্দ্দিষ্ট ধরণের পোষাক পরা, বস্ত্রাচ্ছাদিত আর উলঙ্গ, সকলেরই এ মসজিদে প্রবেশের অবাধ অধিকার আছে।

তবে আমার মসজিদ হচ্ছে যাদুর মসজিদ। একটী নিয়ম পালন না করলে সে মসজিদে কেউ ঢুকতে পারে না। সে নিয়মটী জানবার জন্যে পাঠক নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হবে। সে নিয়মটী হচ্ছে অন্তরের পরিশুদ্ধি—অর্থাৎ, সকল প্রকার হিংসা এবং বিদ্বেষ বর্জ্জন করতে হবে, আর অনাবিল প্রেমের ধারায় অন্তরকে অভিষিক্ত করতে হবে। এইটুকু যদি করতে পারেন পাঠক, তা' হ'লে আপনি আমার মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেন, আর এটুকু যদি না করতে পারেন, তা' হ'লে আমার মসজিদের পথ খুঁজে পাবেন না। যাদুর মসজিদ আপনার চোখের সামনেই থাকবে, অথচ আপনি দেখতে পাবেন না।

প্রত্যেক মসজিদেই এক একজন ইমাম বা ধর্ম্মযাজক থাকেন তাঁর কাজ হচ্ছে ভক্তমণ্ডলীকে পরিচালিত করা, প্রার্থনায় ভজনায় তাদের অধিনায়কত্ব করা। যে সব মসজিদের কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছি, তাদের ভক্তমণ্ডলীর

জন্য বড় বড় জ্ঞানী ইমাম নিযুক্ত আছেন, ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাদের অগাধ পাণ্ডিত্য, তারা মোটা মোটা মাইনে পান, আর ভক্তদের ভক্তিও তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ে থাকেন। তাঁদের সাধারণ বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁরা সকলেই মুসলমান এবং একই সম্প্রদায়ের মুসলমান। এ মহা সম্মানে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানের কোন অধিকার নেই।

আমার যাদুর মসজিদে কিন্তু এ বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। আমার মসজিদে ইমাম হবার জন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক হবারও দরকার নেই। কখনও পারসিক, কখনও হিন্দু, কখনও বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষেরাই আসেন, আর যাঁর যখন সুবিধা হয়, তিনি তখন পৌরহিত্য করেন।

গোড়ায় যে সব মসজিদের কথা বলেছি, সেখানে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহিমাই প্রচার হয়, আর ইস্‌লামের মহাগ্রন্থেরই ব্যাখ্যা হয়। আমার মসজিদে কিন্তু সব ধর্ম্মেরই প্রচার হয়, আর সব ধর্ম্ম গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা হয়। খৃষ্টান আমার মসজিদে এসে New Testamentএর ব্যাখ্যা করে, এহুদি এসে Old Testamentএর ব্যাখ্যা করে, পারসিক এসে জেন্দাবেস্তার ব্যাখ্যা করে, হিন্দু এসে বেদ আর উপনিষদের ব্যাখ্যা করে, মুসলমান এসে কোরাণের ব্যাখ্যা করে, আর বৌদ্ধ এসে জাতকের ব্যাখ্যা করে। যার কাছে যে ধর্ম্ম প্রিয়, সে সেই ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করে। আমি সকলের কথাই ভক্তির সঙ্গে শুনি, আর সকলের প্রচারিত সত্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করি।

প্রত্যেক বড় বড় মসজিদেই কয়েকজন ক'রে খাদেম বা সেবাইত নিযুক্ত আছে। তাদের কাজ হচ্ছে মসজিদকে ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার রাখা, যাতে ক'রে স্থানটী খোদার আরাধনার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। খাদেমদের যথোচিত ভাতার ব্যবস্থাও আছে। কেউ মাসে ভাতা হিসাবে দশ টাকা ক'রে পায়, কেউ মাসে পনের টাকা হিসাবে পায়, কেউ মাসে বিশ ক'রে পায়, আবার কেউ বেশীও পায়।

আমার মসজিদে দুইটী সেবাইত বা খাদেম আছে; প্রেম, পতিব্রতা ; আর ভাতা হিসাবে তারা পায় অনাবিল আনন্দ নামক মুখরোচক এক আধ্যাত্মিক খাদ্য। তারাই আমার মসজিদকে সদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, তাদের ঐকান্তিক চেষ্টার দরুণই আমার মসজিদ খোদার প্রার্থনাযোগ্য দেউল বলে গণ্য হয়।

গোড়ায় যে সব মসজিদের কথা বলেছি, সে সবকে সাধারণ ভাষায় খোদার ঘর বলা হয়—অর্থাৎ খোদা সেখানে থাকেন! ছেলে-বেলায় আমাদের গ্রামের বড় মসজিদটীকে আমরা খোদার ঘর বলে মনে করতুম। কৌতূহল পরবশ হয়ে খোদা ঘরে আছেন কিনা এবং কি করছেন দেখ্‌বার জন্য অনেক সময় সেই মসজিদে প্রবেশ করতুম। খোদার দেখা না পেয়ে ভাবতুম, তিনি বেড়াতে গেছেন কিংবা কোন কাজে গেছেন, আর এক সময় তাঁর সাক্ষাৎ পাব। দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, খোদার সাক্ষাৎ এখনও ইট-পাথরের কোন মসজিদে পাইনি।

তবে আমার এই যাদুর মসজিদে খোদা আসেন, স্বয়ং এসে আমাকে দেখা দেন। পাঠক আমার কথা শুনে অবাক্ হবেন না আর আমার মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন না। খোদার যে হাত পা, আর মাথা মুণ্ড দেখতে পাই সে কথা আমি বল্‌ছি না! তবে তিনি যে আমার মসজিদে আবির্ভূত হয়েছেন, সেটা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি, তাঁর কথা অন্তরে শুন্‌তে পাই, তাঁর ইঙ্গিত অন্তরে দেখতে পাই। তিনি যখন আসেন তখন আমার মন অবর্ণনীয় এক নূরানী আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, অপূর্ব্ব এক আনন্দের ধারা আমার প্রাণে বইতে থাকে, আমি তখন আমার ক্ষুদ্র আমিত্ব ছেড়ে বিরাট্ এক কিছুতে মিশে যাই। ক্ষণিকের মধ্যে কিন্তু সে ভাব চলে যায়! মাটির মানুষ আমি মাটিতে ফিরে আসি!

গ্রীক ভাস্কর পিগ্‌মেলিয়ন দিনের পর দিন ধরে ভিনাস্ দেবীর মূর্ত্তি

গড়েছিল, আর শেষে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির প্রেমে পড়েছিল। আমিও দিনের পর দিন ধরে আমার যাদুর মসজিদ গড়ছি, আর এই মসজিদ গড়ছি, যার জন্য তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা নিত্যই বেড়ে যাচ্ছে।

পিগমেলিয়ন তেমন নিজের গড়া দেবী ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর কাছে যেতে চাইতো না, আমারও মন তেমনি আমার গড়া এই যাদুর মসজিদের যিনি দেবতা, তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন দেবতার কাছে যেতে চায় না। পিগ্-মেলিয়নকে দেবতারা বর দিয়েছিলেন, তার হাতের গড়া দেবীমূর্ত্তি দেবতাদের বরে প্রাণ লাভ করেছিল, আর পিগমেলিয়ন তার প্রণয় লাভ করে ধন্য হয়েছিল। দেবতাদের কৃপাকটাক্ষ কি আমার উপর পড়বে না? যে দেবতার জন্য আমি মসজিদ গড়ছি, তিনি কি সশরীরে তা'তে আবির্ভূত হবেন না? তার প্রণয় লাভ ক'রে আমিও কি পিগমেলিয়নের মতই ধন্য হব না?

বাংলার প্রকৃতি

ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নদী কিংবা রাস্তা এ-দুটোর একটাকে আমি খুঁজেছি। যে দৃশ্যের মধ্যে এ-দুটোর কোনটাই নাই, সে দৃশ্য আমার মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতা দানের জন্য এ-দুটোর অন্ততঃ একটা অপরিহার্য্য উপকরণ বলেই আমার মনে হয়েছে।

বাগান যত সুন্দর হোক, আর বাগান বাড়ী যত সুরম্যই হোক, সামনে তাদের নদী আর নদীর পারে মাঠ না থাকলে আমার তাতে তৃপ্তি হয় না। পক্ষান্তরে নদী আর মাঠ এ-দুটো পেলে, বাগান-বাড়ী যদি কুঁড়ে ঘরও হয়, আর

বাগান বলতে যদি দুচারটে নারকেল আর সুপারি গাছ ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাতেও আমি সন্তুষ্ট !

যতগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য, তা সে ছবিতেই হোক, আর জীবনেই হোক, আমার মনের মধ্যে চিরতরে রেখাপাত করে গেছে। তাদের সবের মধ্যে নদী কিংবা রাস্তা, এদুটোর মধ্যে একটানা একটা, আর কোন কোনটার মধ্যে দুটোই আছে। একটী বিশেষ দৃশ্যের কথা আজ পাঠককে বলবো। এত স্পষ্ট হয়ে সে দৃশ্যটী আমার মনে আঁকা রয়েছে, আর তার স্মৃতি আমার অন্তরের সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে জড়িত আছে যে, এমন একদিন প্রায় যায় না, যেদিন সে দৃশ্য আমার মনে ভেসে উঠে না। আমার নানির বাড়ীর দৃশ্যের কথাই এখানে বল্‌ছি।

পৃথিবীর তিনটে মহাদেশ আমি দেখেছি। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের বিখ্যাত প্রাকৃত্রিক দৃশ্যের অনেক আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আর অনেকের বর্ণনা পড়েছি, ছবি দেখেছি, গল্প শুনেছি। কোন দৃশ্যই কিন্তু আমার মনে, ভাবের সে গভীর হিল্লোল তুলতে পারিনি. যা বাঙ্গালার একটী অজ্ঞাত পল্লীর সেই অখ্যাত দৃশ্যটী তুলেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, কোন দিন যদি কোন কারণে, আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, আর জীবনে যে সব দেশ দেখেছি, সে সবের কথা আমার মন থেকে বিলুপ্ত হয়, তা হলেও নানাদের দেশের ছবিটী ঠিক এখনকার মত আমার মনে জেগে থাকবে। সে ছবি কখনও বিস্মৃতির সাগরে তলিয়ে যাবে না।

যারা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আমার প্রিয় দৃশ্যের বর্ণনা শুনে অবজ্ঞার হাসি সম্বরণ করতে পারবেন না। তাতে বড় কিছু আসে যায় না। যা থেকে আমি অমন নিবিড় আনন্দ পেয়েছি, তার গৌরব ঘোষণায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নেই। অন্যে যদি সে দৃশ্য দেখে, কিংবা তার বর্ণনা শুনে, আমার মত আনন্দ না পান, সেটা তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব ?

বাড়ী বলতে ছিল ছোট্ট একটি কোটা, কয়েকখানি খোড়ো ঘর, আর সদোয়ে খড় দিয়ে ছাওয়া মাটীর একটি দহলিজ। সে বাড়ীকে প্রাসাদ বলে ভুল করবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সামনে খানিকটা জমি ছিল বেড়া দিয়ে ঘেরা, নানাজি তাতে ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ বসিয়েছিলেন। তা ছাড়া শাকসজীর গাছও ছিল। বেড়ার বাহিরে চৌকো আকারের মাঝারি রকমের একটি আমের বাগান, মাঝখানে তার একটা পুকুর, আর বাগানের অপর প্রান্তে একটি ইদগাহ্। সবই মামুলী ধরণের জিনিষ। কোন বিশেষত্ব এ সবের মধ্যে ছিল না। এসবকে বিশেষত্ব দিয়েছিল এদের Setting। বাগানের পূব দিক দিয়ে এঁকে বেঁকে ছোট্ট একটী নদী চলেছিল অসীম সমুদ্রের পথে। নদীর অপর পারে পায়ে-হাঁটা একটী পল্লীপথ,—সে পথও চলেছিল পৃথিবীর অন্তহীন পথের জালের সঙ্গে মেলবার জন্যে। পথের পাশে লোকদের বাড়ী, তার পর বিস্তীর্ণ মাঠ। বাগানের পশ্চিম দিকে পায়ে-হাঁটা একটি পথ, তার পর মাঠ। মাঠের প্রান্তে একটী মোস্‌লেম পল্লীর ঘর, বাড়ী, বাঁশবন, আমবাগান প্রভৃতি ঝাঁপসা হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর তাদের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটে উঠেছিল সাদা ধপ্‌ধপে একটি গোম্বজবিশিষ্ঠ মসজিদ—মোসলেম পল্লীর জীবন কেন্দ্র।

দক্ষিণ দিকে কতকটা পথ গিয়ে নদী বাঁক ফিরেছিল। বাঁকের মুখে নদীটা খুব চওড়া। বাঁকের এক দিকে নৌকার ঘাট, সেখানে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা থাকতো; আর অপর দিকে ছিল প্রকাণ্ড একটী বট গাছ, এক-পাল রাজহাঁস তলায় তার খেলা করতো। নদী বাঁক ফিরে পূবদিকের গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

নানাদের বাগান থেকে একটা বাঁশের সাঁকো নদী অতিক্রম করেছিল, তাই দিয়েই লোক এপার ওপার যাওয়া আসা করতো। নানাদের পারে নদীর পাড়ে একটা বাঁশবন ছিল। আমি সেই বাঁশবনে দাঁড়িয়ে

অনেক সময় নদীর উপর দিয়ে নৌকার যাওয়া-আসা দেখতুম আর কত কি ভাবতুম!

দৃশ্যটী যে সুন্দর তা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করবেন যে সৌন্দর্য্য আমি যে দৃশ্যের মধ্যে অনুভব করেছি লেখায় তা ব্যক্ত করা কঠিন। আমি যদি চিত্রকর হতুম, তুলিকার সাহায্যে তাহলে অনুভূতিকে আমার রূপায়িত করবার চেষ্টা করতুম। দৃশ্যটীর বৈশিষ্ট্য এই যে বঙ্গ প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সুন্দর এবং রমণীয় উপকরণ আছে, সকলেরই এখানে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছিল। প্রান্তর, পল্লী, বাঁশবন, গ্রাম্যপথ, ইদগাহ, পুকুর, আমের বাগান, পল্লী-গৃহস্থের বাড়ী, নদী, নদীর বাঁক, সাঁকো, বট গাছ, রাজহাঁস প্রভৃতি পল্লী দৃশ্য বা Landscape-এর বিভিন্ন উপকরণকে এমন সুন্দর এবং সুবিন্যস্তভাবে সেখানে রাখা হয়েছিল যে কোন দক্ষ আর্টিষ্ট চেষ্টা করেও তার চেয়ে সুন্দর করে তাদের রাখতে পারতেন না।

আমার শিশু-মন সবে মাত্র তখন বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এই রং আর রসে-ভরা পৃথিবীর দিকে চাইতে আরম্ভ করেছে। সুন্দর জিনিষ সেই মনের কাছে তখনও তার অভিনবত্ব হারায় নি, প্রকৃতি তখনও অচিন্তনীয় রহস্যে ভরপুর, কল্পনা তার চঞ্চল পক্ষ বিস্তার করে তখন বিচিত্র মায়া-রাজ্যের সফরে নিত্য নিয়ত ব্যস্ত! সেই অনুকূল অবস্থায় এই মনোরম দৃশ্যটী যে আমার মানসপটে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তবে আমার বাল্য সেই মধুর অনুভূতির কথা বলবার জন্যই আজ আমি লেখনী ধরিনি, সেই অনুভূতিকে উপলক্ষ্য করে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের (asthetic sense-এর) দু' একটি বিশেষত্বের আলোচনা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য।

নদীর প্রতি, পথের প্রতি, সীমাহীন যা কিছু তার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক একটা টান আছে। প্রান্তরের উদারতা আমাদের মনকে পুলকিত করে। প্রান্তরের অন্তস্থিত কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন পল্লীর বিচিত্র শোভা আমাদের মনে

pathetic ভাব জাগিয়ে তোলে। বাঙ্গালার পল্লী সৌন্দর্য্যে মসজিদেরও বিশিষ্ট একটী স্থান আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্য অস্তিত্বের দুঃখের মধ্যে পশু পক্ষীর সে প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি।

নদীর প্রতি, গতিশীল স্রোতের প্রতি মানুষের মনের টান সব দেশের এবং সব জাতের সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায়। মানবীয় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিন, খোদার গ্রন্থ কোরাণেও বেহেস্তের (স্বর্গের) বর্ণনায় নদীর উল্লেখ করা হয়েছে—"তাজ্‌রি মেন-তাহতেহাল আনহার"—বেহেস্তের বাগানের নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

বর্ষা যে কতদূর পথের আকর্ষণ তা এক ইংরাজি সাহিত্যের পথ বিষয়ক কবিতা পড়লেই রচনা প্রভৃতি বুঝতে পারবেন। পথের ডাক কবি John Masefield অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

My Road calls me, lures me
West, East, South and North ;
My Road leads me forth
To add more miles to the tally
Of grey miles left behind,
In quest of that one Beauty
God put me here to find.

প্রান্তরের ডাক ওমর খাইয়ামের কবিতায় অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে—

With me along some strip of Herbage strewn,
That just divides the desert from the sown,
Where name of slave and sultan is not known,
And pity Sultan Mahmud on his Throne,

Here with a loaf of Bread beneath the Bough,
A flask of wine, a Book of Verse—
And thou Beside me singing in the Wilderness;
And wilderness is Paradise enough.

শরীর আমাদের ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হলেও আমাদের মন হচ্ছে অসীম, অন্তহীন, বিশ্বব্যাপী। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ দেহের মধ্যে অসীমের এই microcosm (বিশ্বের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) টুকু বন্দী হয়ে আছে। বন্দীর জীবন তার ভাল লাগে না। ক্রমাগত তাই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সীমার বন্ধন ছাড়িয়ে অসীমের মুক্ত বাতাসে পালাবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। আহেরমাজদার সঙ্গে জারদাস্তের যেমন সংগ্রাম চলেছে, জড়ের সঙ্গে আত্মারও সেই রকম সংগ্রাম চলেছে। আত্মা আমাদের তাই সীমাবদ্ধ কিছু দেখলেই তাকে শত্রু বলে স্থির করে, আর উদার সীমাহীন, কিছু দেখলেই তাকে আত্মীয়রূপে বরণ করে নেয়। স্থবিরতা আমাদের মুক্তিকামী আত্মাকে পীড়িত করে, গতি তাতে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করে।

নদী এবং পথ, এ দুইয়ের মধ্যেই আছে সীমা থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস। উভয়েই চলেছে অনন্তের উদ্দেশ্যে। আনন্দে তাই আত্মা আমাদের তাদের সঙ্গে অনন্ত পথের পথিক হয়। তাদের সাহচার্য্যে মন আমাদের বিচিত্র এই বিশ্বের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পরিভ্রমণ করে। তার পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনের কথা সে তখন ভুলে যায়। ক্ষণিকের তরে সে তার অশরীরী জীবনের স্বাধীনতা ফিরে পায়। নদীর প্রতি, পথের প্রতি তাই তার এত দরদ, এত ভালবাসা।

যে বিরাট বিশ্বে আমাদের জন্ম, প্রান্তর তারই কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যে শিশু microcos টী আমাদের অন্তরদেশে অবস্থিত, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অঙ্গ সঞ্চালনের সে উপযুক্ত স্থান পায়। আমাদের প্রাণ তাই সীমাবদ্ধ গৃহ ছেড়ে প্রান্তরে পালাবার জন্য ছটফট করতে থাকে, আর সেখানে যেতে পারলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

বিরাট দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য আমাদের জীবনকে ঘিরে রয়েছে। সেই রহস্যের মধ্যেই আমাদের জন্ম, আর সেই রহস্যের মধ্যেই আমাদের মৃত্যু। রহস্যময় এই বিশ্বে থাকবার উপযোগী করেই প্রকৃতি আমাদের প্রস্তুত করেছে। রহস্যের দিকে তাই আমাদের স্বাভাবিক টান। কোন জিনিষের মধ্যে রহস্যের একটু আভাস পেলে তা দেখে আমাদের মন পুলকিত হয়, আর সেই রহস্যকে অনাবৃত করবার চেষ্টায় আমরা মেতে যাই। এই করেই আমাদের কল্পনা স্ফূর্তি লাভ করে, আমাদের কবিত্ব শক্তি জেগে উঠে। প্রান্তরে অবস্থিত বৃক্ষ ছায়াবৃত অস্পষ্ট পল্লীর রহস্যময় ছবি দেখে পুলকে তাই মন আমাদের নেচে ওঠে। রহস্যাবৃত সেই পল্লী যেন আমাদের রহস্যাবৃত জীবনেরই একটী প্রতীক। তাকে নিয়ে আমরা কত রকম জল্পনা কল্পনা করি, কত রকম জিজ্ঞাসাবাদ করি। কারা সেখানে থাকে, তারা কি করে, কেমন তাদের ঘরগুলি, কি করে তাদের দিন চলে, এই সব কত কি কথা! সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনে রহস্যময় জিনিস সৌন্দর্য্যের কবিত্বের, ভাবের বিচিত্র এক জগৎ খুলে দেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে রহস্যের আভাসকে তাই এত আদরের সঙ্গে আমরা বরণ করে নিই।

জীবন্ত প্রাণী ছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। Landscape-এর ছবি যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে জীবনের কোন আভাস না পেলে আমরা সন্তুষ্ট হই না। সেই ছবিতেই আবার একটা হরিণ কিংবা দুটো পাখী বসিয়ে দিন, দেখবেন ছবির চেহারাই বদলে গেছে। যা একান্ত দূরের বলে মনে হতো, আমাদের তা অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা দেখে আমরা কেবল বিস্মিত স্তম্ভিত হতুম, তা দেখে এখন আনন্দিত, পুলকিত হচ্ছি। আর যেখানে যাবার কল্পনাও করতুম না, সেখানে কখনও যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। Artist এই সত্যটী বেশ ভাল করেই বোঝেন। Landscape-এর তাই তারা পশু কিংবা পক্ষীর ছবি দিতে ভোলেন না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট হচ্ছে চীনেরা। তাঁদের রচিত ছবিতে পশু পক্ষীকে চিত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপেই আমরা দেখতে পাই।

পৃথিবী যতই সুন্দর হোক, তার সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ হয় না, যতক্ষণ না প্রাণের স্পন্দন তাতে আমরা অনুভব করি। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর এই নাড়ীর যোগ হচ্ছে জীবনের অন্যতম মূলগত সত্য!

আমাদের পল্লীর landscape-এ মসজিদের বিশিষ্ট একটা স্থান আছে। আমি মুসলমান। একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সমাজে এবং পরিবারে আমার জন্ম। যেদিন থেকে এই পৃথিবীতে এসেছি, সেই দিন থেকেই মসজিদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। শৈশবে মসজিদকে আল্লার ঘর বলেই জেনেছি। আল্লা সেখানে থাকেন, কিংবা সে ঘরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে এই রকম একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে মসজিদে গিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর করুণার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্চে আমাদের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

তা ছাড়া অমোস্‌লেম-প্রধান এই ভারতবর্ষে মসজিদকেই আমরা শত শত বৎসর ধরে আমাদের সুদৃঢ় কেল্লা বলে মনে করে আসছি। আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, সহজ বুদ্ধির নির্দ্দেশে এই মসজিদ-প্রাঙ্গণে এসেই আমরা সমবেত হয়েছি আর এইখানেই সলা পরামর্শ করেছি। জীবনে মরণে মসজিদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আর তাই, শিশু যেমন ঘরের মধ্যে তার মাকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমরাও কোন গ্রামে কিংবা সহরে মসজিদের মিনার কিংবা গোম্বজ না দেখলে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

তবে একথাও বলব, যে, কেবল এই Biological কিংবা Sociological কারণেই আমি মসজিদের প্রয়োজন অনুভব করি না। তার aesthetic কারণও আছে। মসজিদের স্থাপত্যে শিল্পী যে মানুষের মনের শ্রেষ্ঠতম ভাবকে

সুন্দরতম ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত করেছেন একথা এখন সব দেশের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানীরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাজমহলের বিষয় কবি বলেছেন "Stone turned into a dream." তাজমহলের Design এবং Styleও যা সাধারণ এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটী মসজিদের Design এবং Style ও তা। কবির কথার একটু পরিবর্ত্তন করে মসজিদের বিষয়ও বলা যায়, "It is brick and morter turned into a vision and an affirmation," অবশ্য পাঠক মনে করবেন না যে তাজমহলের সুক্ষ্ম কারুকার্য্যের সঙ্গে আমি সাধারণ মসজিদের তুলনা করছি।

গোম্বজ, মিনার, মেহবার সবের দৃষ্টিই আকাশের দিকে—মানবের আত্মা যেন অন্তরীক্ষে আল্লারনূরের জ্যোতি অপূর্ব্ব এক "জালওয়া" দর্শন করে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে আছে। সম্মুখেও তার দৃষ্টি নাই, পশ্চাতেও দৃষ্টি নাই, ডাইনেও দৃষ্টি নাই, বামেও দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে উর্দ্ধে, সপ্ত-স্তর-বিশিষ্ট আকাশের দিকে, যেখান থেকে বিকীর্ণ হচ্চে আমাদের অন্তরের আলো, স্থাবর জঙ্গম সকলের পথ-দেখবার, পথ-চেনবার একমাত্র আলো—নূরে রব্বানি—আল্লারনূর। মসজিদের স্থাপত্য মানবের এই দুর্ল্লভ দিব্যদৃষ্টির কথা, তার "Vision glorious এর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সে স্থাপত্য আরও স্মরণ করিয়ে দেয় মানবের, মানবাত্মার গৌরবময় স্বীকারোক্তির কথা। আল্লা যেন তাঁর নূরের আলোকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ভাসিত করে বজ্রনির্ঘোষে মানুষকে সুধাচ্ছেন "হে আমার বান্দা, (দাস) তুমি কি আমার আদেশ পালনের দায়ীত্ব গ্রহণ 'করতে প্রস্তুত আছ ?" আর মানুষ বুক চাপড়ে প্রভুর দিকে মুখ উন্নত করে দৃপ্তকণ্ঠে বলছে "লব্বায়েক ইয়া রব্বানা, লব্বায়েক" (নিশ্চয় প্রভু সর্ব্বদা আমার, তোমার আদেশ গ্রহণের জন্য নিশ্চয় আমি প্রস্তুত আছি)!

মসজিদ হচ্চে একাধারে মোস্‌লেমের metaphysics এবং Ethics সৃষ্টি-দর্শন এবং নীতি-দর্শনের অভিব্যক্তি। মোসলেম পল্লীর অন্তরাত্মা যেন

মসজিদের চুণ সুরকি এবং ইটে জমাট বেঁধে উঠেছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে যেমন তার আদর্শের সন্ধান করি, লোকালয়ের মধ্যেও তেমনি তার অন্তর্নিহিত আদর্শের সন্ধান আমরা করি, আর বঙ্গের মোসলেম পল্লীতে সন্ধান আমরা পাই—ঐ 'মসজিদে'। ব্যক্তিগত আত্মার অভিব্যক্তি না থাকলে যেমন মানুষের প্রতিকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সমষ্টিগত আত্মার অভিব্যক্তি না থাকলেও তেমনি লোকালয়ের প্রতিকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। বাঙ্গালার মোসলেম পল্লীর প্রতিকৃতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তাই মসজিদের প্রয়োজন।

নানাজি এবং নানিজান উভয়েই পরলোকে চলে গেছেন। মামুরাও সকলে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। নানার বাড়ী যাওয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর থেকে আমাদের বন্ধ আছে। নানার দেশের ছবিটী কিন্তু এখনও কালকে-আঁকা ছবির মতই আমার মনের চিত্রালয়ে জ্বল জ্বল করছে। আর যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবো, ততদিন যে সে ছবি ম্লান হবে না সে কথা আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। সে ছবিতে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাণ-বস্তুটী চিরকালের তরে আমার চোখে ধরা দিয়েছে।

বাদলের দিন

দেখতে দেখতে আকাশে বাদল ঘনিয়ে এলো। ঝুর ঝুর করে' বৃষ্টি সুরু হ'ল। বেশ একটু ঝড়ও সঙ্গে সঙ্গে বইতে লাগলো। হাতের বইটা মুড়ে আমি প্রকৃতির বিষাদ-লীলা দেখতে লাগলুম। একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা —অপূর্ণ উৎসবের করুণ এক স্মৃতি প্রাণের মধ্যে মধুর অথচ বেদনা ভরা আশাটি

গুঞ্জরণ তুলতে লাগলো। অনেক দিন পূর্ব্বে শোনা উর্দ্দু কবির একটা বিস্মৃতিপ্রায় গজলের ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দগুলি বৃন্তচ্যুত গোলাপের বিক্ষিপ্ত পাপড়ীর মত আমার মনের বর্ষাস্নাত প্রাঙ্গণে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। কবি তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটীকে ভাষার ইন্দ্রজালে জীবন্ত করে' তুলেছেন। তাঁর কথার যাদু আমার প্রাণের সুপ্ত বাসনাকেও জাগিয়ে তুলেছিল। কবি চেয়েছেন শ্রাবণের দিন, "সাওনকা তো মাহিনা হো।" আর চেয়েছেন ঝুর ঝুরে বৃষ্টি, "নাম্নি নাম্নি বরসতা হো।" আর চেয়েছেন পিয়ালা ভরা মদিরা, "সরাবকা তো পিয়ালা হো।" আর সকলের উপর চেয়েছেন, বাগানের সুষমার নিখুঁত প্রতীকের মত এক সাকী। এই তুচ্ছ ক'টী জিনিষই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, এর বেশী কিছুই তিনি চান না। কি মর্ম্মস্পর্শী নম্রতা!

আমার প্রাণ কিন্তু উর্দ্দু কবির চেয়ে অনেক অল্পেই সন্তুষ্ট হয়! আমি যদি শ্রাবণের মেঘভরা আকাশ আর ঝুর ঝুরে বৃষ্টি পাই; সেই সঙ্গে নদী তীরের বাগানের এক নিরালা বারান্দা আর সেখানে আরামে বসবার একখানা চেয়ার পাই, আর পাশের টেবিলে পাই হাফেজের একটী দেওয়ান আর এক টীন সিগারেট, তা হ'লে অনিন্দ্যসুন্দরী সাকী আর ইয়াকুতি সরাব না হলেও আমার বেশ চলে' যেতে পারে। কল্পনা-সুন্দরীর যাদুভরা কটাক্ষই আমার চিত্তবিনোদনের জন্য যথেষ্ট।

আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, ভোগের বিষয়ে আমি যথেষ্ট economical, বেশী জিনিষ একসঙ্গে উপভোগ করতে আমার প্রবৃত্তি একেবারেই হয় না। এক সময় একটী জিনিষকে (অবশ্য তার আনুষঙ্গিক উপচারাদির সাহায্যে) ভোগ করতে আমি ভালবাসি; তার বেশী হলে' আমার enjoyment-টা পণ্ড হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমার রুচি কতকটা জাপানীদের মত। শুনেছি, তারা একটা ঘরে এক সময় একটার বেশী ছবি রাখে না; বলে, অনেক ছবি

এক সঙ্গে রাখলে কোনটাই উপভোগ করা যায় না। তাদের মনোভাব আমি বেশ বুঝতে পারি; কারণ আমার প্রাণও তাদের কথায় সায় দেয়।

এই যে বাদলের দিনের কথা বলছিলুম, মনের মধ্যে তখন মিষ্টি একটা বিষাদের ভাব আসে, যা বড়ই উপভোগ্য! উৎকট কোন আনন্দ তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কিন্তু সে ভাবটা থাকে না। একেবারেই যে থাকে না, তা বলতে পারি না। সেটা তখন মনের তলায় থিতিয়ে পড়ে, আর সেখান থেকে উপরের আনন্দকে তিক্ত করে' তুলতে থাকে! ফলে প্রাণ খুলে আমরা আনন্দ করতে পারি না। মন বিরক্তির এক দারুণ অশান্তিতে ভরে যায়। তাই বলছি, প্রকৃতি যখন মনের মধ্যে আপনা থেকেই একটা বিষাদের রাগিণী তোলে, তখন জোর করে' তাকে সরিয়ে, কৃত্রিম উল্লাসের এক ছন্দহীন অট্টহাসিতে হৃদয়তন্ত্রীকে ব্যথিত করার পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। আমি এই বিষাদের সঙ্গে আমার বেদনা ভরা প্রাণের করুণ ক্রন্দন মিশিয়েই প্রকৃত আনন্দ পাই।

পরের কথা বলতে পারি না, তবে আমি সেই বাদলের দিনে মাশুক সন্দর্শনের চেয়ে মাশুকের কথা ভেবেই বেশী aesthetic আনন্দ পাই। বাদলের বাদ্য-শিল্পী তার সুনিপুণ তানের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আমার মনকে সেই করুণ রসের জন্যই বিশেষ করে' প্রস্তুত করে। বিরহের বেদনা তখন মনের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-উদ্বেগভরা এক অপূর্ব্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে; যার মৃদু মধুর হিল্লোলে প্রাণ এক স্বর্গীয় পুলকে পরিপ্লুত হয়ে যায়। কোন স্থূলতর আনন্দ তখন ভাল লাগে না।

বিরহের ইন্দ্রজাল প্রেমাস্পদের অপূর্ণতার কথা, তার ত্রুটীবিচ্যুতির কথা, তার অনিত্যতার কথা একেবারে আমাদের ভুলিয়ে দেয়। কল্পনার জীবন-কাঠির পরশে সে তখন অপূর্ব্ব এক দৈবরূপ লাভ করে—যা বাস্তব জগতে কারও ভাগ্যে ঘটে না, মাশুকের ভাগ্যেও না! তার সেই ত্রিদিব-দুর্ল্লভ রূপ নিয়ে সে আমাকে

ফেরদৌসের গোলাপ-শোভিত বুলবুল-মুখরিত, কল্লোলিনী-বিধৌত নিকুঞ্জ বনে নিয়ে যায়। তুচ্ছ এই পার্থিব জগৎ কতদূরে তখন পড়ে থাকে!

"যো-মজা এন্তেহার মে দেখা, ওজ না-কভি ওসালে ইয়ার মে পায়া।" (যে-আনন্দ বিরহের ব্যাকুলতায় পেয়েছি, মিলনের মধ্যে তার সন্ধান কখনও পাই নি)। বিরহের সেই ব্যাকুলতার উপভোগ্যের জন্য বর্ষার মেঘম্লান দিন যেমন অনুকূল, অন্য কোন দিন তেমন নয়। কবি কালিদাস তাই এই মেঘভরা বাদলের দিনকেই বিরহী যক্ষের হৃদয়ের মধুর খেলা দেখাবার জন্য পছন্দ করেছেন, অন্য কোন দিনকে করেন নি।

আমি বলেছি, বাদলের মাধুর্য্য উপভোগ করবার জন্য আমি নদী তীরের একটী বারান্দা চাই। সেই বারান্দাটিকে কিন্তু আমার একার জন্যই বরাদ্দ করে দিতে হবে আর কেউ সেখানে থাক্‌লে মন আমার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই আটক থাকবে; বাস্তবতার শৃঙ্খল ছেড়ে কল্পনার অন্তহীন আকাশে স্বচ্ছন্দ-গতিতে সে উড়ে বেড়াতে পারবে না।

তবে ঘরের ভিতর যদি দু'চার জন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাস কিংবা দাবা খেলায় ব্যস্ত থাকেন, আর ঘন ঘন ভিতরে এসে আমায় বিরক্ত না করেন, তা'হলে তাতে আমার ভাবের খেলায় ব্যাঘাত হবে না; পক্ষান্তরে, তাঁদের সেই নেপথ্যের অস্তিত্ব, কোন সুদূর-বাসী বন্ধুর পত্রের স্নিগ্ধ স্নেহ-সম্ভাষণের মত, আমার মনকে পরিত্যক্তের তীক্ষ্ণ ব্যাকুলতা থেকে রক্ষা করবে।

অবশ্য সারাদিন যে এই রকম ভাবে বিভোর হয়ে' থাকতে পারবো সে-কথা আমি বল্‌ছি না। দেহের মত কল্পনারও শ্রান্তি আছে। তার পাখা দুটীও ঘুরে ঘুরে শেষে অবশ হয়ে পড়ে। দেহ নামক জীবটী বহুক্ষণ ধ'রে অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে-ও হাত-পা ছোড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে অবস্থা যখন আসে, তখন ভাবের আবেশময় জগৎ ছেড়ে দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম-কোলাহলে ফিরে আসা আমার জন্য প্রয়োজন হয়ে' পড়ে।

বেড়ানর আনন্দ

নানা লোক নানা Recreation থেকে আনন্দ পেয়ে থাকেন। বেড়ানই হচ্ছে আমার প্রধান Recreation; আর যে বিরল, বিমল আনন্দ যা থেকে আমি পেয়েছি, তা সত্যই বর্ণনাতীত মধুর। জীবনের অনেক জিনিষ ছাড়তে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বেড়ানর আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে কোন মতেই আমি রাজী নই; পরন্তু এই অভ্যাস বাহাল রাখার জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার আমি করতে পারি, অতি অল্প জিনিষের বিষয়ই ততটা উদারতা দেখাতে পারবো বলে আমার মনে হয়।

সেদিন একজন বলছিলেন, বেড়ানো তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। একা বেড়াতে বেরুলে তাঁর মন অত্যন্ত gloomy হয়ে ওঠে, আর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়ে তিনি যে আনন্দ পান, ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে, কিংবা তাস খেলে তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়ে থাকেন। বন্ধুর কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হল। প্রতিকূল নিয়তি জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে।

আমি একা বেড়িয়েও আনন্দ পাই; আর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়েও আনন্দ পাই; সহরে বেড়িয়েও আনন্দ পাই, আর পল্লীতে বেড়িয়েও আনন্দ পাই; লোকালয়ে বেড়িয়েও আনন্দ পাই, আর বিজনে বেড়িয়েও আনন্দ পাই, জঙ্গলে বেড়িয়েও আনন্দ পাই আর মাঠে বেড়িয়েও আনন্দ পাই। আমার এই বেড়ানর জীবন হচ্ছে, নিত্য-নূতন আনন্দে ভরপুর।

বন্ধু বলছিলেন, একা বেড়াতে বেরুলে তিনি gloomy হয়ে উঠেন। আমি কিন্তু একা বেড়ানই বেশী পছন্দ করি। gloomy হওয়া তো দূরের কথা, সন্ধ্যার সময় ছড়ি হাতে করে যখন মাঠে বেরিয়ে পড়ি, তখন সত্যই মনে হয়,

এই পাপ-তাপপূর্ণ পৃথিবী ছেড়ে আনন্দ-লোকের অভিযানে বেরিয়েছি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র আনন্দানুভূতিতে মন কানায় কানায় ভরে উঠে। অভিযান শেষ করে যখন ঘরে ফিরি, তখন মনে হয় না যে, কলকাতার ময়দান কিংবা অন্য কোন বিশেষ জায়গা দেখে এলুম; তখন সত্যই মনে হয়, সমস্ত বিশ্ব-জগৎটা পরিদর্শন করে এলুম; যত বন্ধু, যত শত্রু আছে, সকলের সঙ্গে বিশ্রামালাপ করে এলুম; আর সত্য-শ্রেয়-সুন্দরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটা নূতন করে গুছিয়ে-গাছিয়ে এলুম। সত্যই সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি!

অনেকে মনে করেন বেড়ান এক ঘেয়ে জিনিষ, আর প্রত্যহ একই জায়গায় বেড়ান, নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন একটা কায়িক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। পরিতাপের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমায় বলতে হচ্ছে, তাঁরা চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও কালা, আর হৃদ-যন্ত্র থাকতেও অনুভূতিহীন। এমন একটা অর্থহীন কথা তা না হলে তাঁরা বলতেন না।

কলকাতায় সাধারণতঃ আমি ময়দানেই বেড়াতে যাই। আমার বেরোবার সময় হচ্ছে ৫টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। আপনি বলতে পারেন, রোজ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেরুলেই হয়। Routineএর তাতে বিশৃঙ্খলা ঘটে না, জীবনের কাজগুলো নিয়ম মাফিক চলতে থাকে।

অনির্দ্দিষ্ট সময়ে বেরোনোর দরুণ Routineএর বিশৃঙ্খলা হতে পারে কেন, হয়েই থাকে। তবু কিন্তু বেড়াবার সময় নির্দ্দিষ্ট না করে, ইচ্ছা করেই আমি অনির্দ্দিষ্ট রেখেছি। আমার মনে হয়, ঘর-বাড়ী, আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, মাঠ-ময়দান সবার চেহারাই প্রত্যেক ঘণ্টায় (প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, যদিও আমাদের তা প্রত্যক্ষ হয় না) বদলাতে থাকে। ময়দান পাঁচটার সময় এক রকম দেখায়, ছয়টার সময় আর এক রকম দেখায়, আবার সাতটার সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখায়। যে-সব সুন্দরের connoisseur বা বিশেষজ্ঞেরা দার্জ্জিলিং কিংবা সিমলা না গেলে প্রকৃতির কোন দর্শনযোগ্য

মূর্ত্তি দেখতে পান না, তাঁদের নিরস-নিরেট চেহারা দেখলেই আমার হাসি পায়।

আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, কলকাতার এই ময়দানে প্রকৃতিকে দুদিন আমি এক মূর্ত্তিতে দেখিনি! তার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বহিরাবরণের মধ্যে প্রত্যহ নূতন একটা mood বা সূক্ষ্মভাবের বিকাশ দেখেছি, আর তা থেকে নূতন রসের আস্বাদ পেয়েছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই অফুরন্ত বিচিত্রতার নিত্য-নূতন রস যথাসম্ভব উপভোগ করবার জন্যই বেড়ানটাকে আমি কোন বিশেষ সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখি না। প্রাণ যখন চায়, তখন বেরিয়ে পড়ি।

অস্তগামী সূর্য্যের মহিমান্বিত মহাপ্রয়াণ একটা দেখবার জিনিষ বটে। রোজ দেখতে দেখতে পুরান হয় না, এমন জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে। এই Sun-Set বা সূর্য্যাস্তের দৃশ্য তাদের অন্যতম। ঔপন্যাসিক Arnold Benett বলেছেন, তিনি Sun-Set এর চেয়ে একটা বড় দোকানের জানালার দেখতে বেশী ভালবাসেন। বেনেট সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। যে দৃশ্যের মহিমা স্বচক্ষে দেখে তিনি অনুভব করেন না, তর্কের জোরে তাঁকে তা অনুভব করান যায় না! তবে নিজের বিষয় আমি বলিতে পারি, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দুচোখ ভরে পশ্চিম আকাশের দিকে একবার না চাইলে মনে হয়, মস্ত বড় একটা কিছু থেকে আজ বঞ্চিত হলুম। রঙের সেই বিচিত্র বিলাস, তরল সৌন্দর্য্যের সেই ঐন্দ্রজালিক হিল্লোল যদি কারও প্রাণে আনন্দের স্পন্দনের সৃষ্টি না করে, তা হলে সে প্রাণের জন্য দুঃখ করা যেতে পারে, প্রার্থনা করা যেতে পারে, তাকে নিয়ে কিন্তু গর্ব্ব করা চলে না। কেউ যদি বলে, আমি Faustএর অভিনয়ের চেয়ে Nigger ministrelদের নাচ দেখতে ভালবাসি, বেনেট সাহেব নিশ্চয় তাকে Philistine (বর্ব্বর) বলে গাল দেবেন। সূর্য্যাস্তের দৃশ্যের বিষয় তিনি যা বলেছেন, তার জন্য তাঁকেও যদি কেউ এই দলের শামিল করে, তাহলে সে কি বড় বেশী অন্যায় করবে?

এই সূর্য্যাস্তের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যেই আমি পরীর দেশের ঐন্দ্রজালিক শোভা দেখেছি, রাক্ষস-দুর্গাবরুদ্ধ রাজকুমারীর ম্লান মুখের অনবদ্য মাধুর্য্য দেখেছি, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রান্তরে ফেরেশ্‌তাদের আড়ম্বরপূর্ণ অভিযান দেখেছি। বিগলিত সৌন্দর্য্যের তরল এই সরোবর থেকে দু'এক ফোঁটা রং ধার করে আমি আমার কল্পরাজ্য রচনা করেছি, আর এই সরোবরে ডুব দিয়েই আমি বিফল-প্রয়াসের মর্ম্ম-বেদনা ভুলেছি, অবজ্ঞার অন্তর্দ্দাহ ভুলেছি, তুচ্ছের আস্ফালনের কথা ভুলেছি। অপরিসীম আনন্দে এই সরোবরে সাঁতার কেটে আমি ফেরদৌসের (স্বর্গের) বাগানের ফুলের শোভা দেখে এসেছি, হুরীদের বিলোল কটাক্ষের ছাপ অন্তরে এঁকে এনেছি, কওসরের লাল শরাবের ইয়াকুতি আভায় আমার চক্ষুকেও অনুরঞ্জিত করে এনেছি। Whiteaway Laidlaw কিংবা Hall & Andersonএর দোকানের জানালার কোন দৃশ্য এসব অনুভূতি আমার মনে কখনও জাগিয়ে তুলতে পারেনি ; Benett সাহেবের মনে জাগিয়ে তুলতে পেরেছি কি না তিনিই বলতে পারেন।

বাবা একবার আমায় বলেছিলেন, সমস্ত জীবনের মধ্যে নামাজ পড়ে তিনি সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন, একদিন সূর্য্যাস্তের সময়, ডানকুনির মাঠে, একটী নৌকার উপর। আমাদের বাড়ীর নিকট ডানকুনির মাঠ বলে প্রকাণ্ড একটী জলা আছে। বর্ষার সময় সেটী জলে ভরে যায়, নানারকম জলচর পাখী এসে তখন স্থানটীকে গুলজার করে তুলে। পিকনিক এবং শিকারের জন্য তখন ডানকুনির মাঠ একটী আদর্শ স্থানে পরিণত হয়। এই পিকনিকের জন্যই বাবা নৌকা করে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে জলায় গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে জলাতেই সন্ধ্যা হয়, আর মগরবের (সন্ধ্যার) নামাজের সময় আসে। বাবা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের মত নৌকাতেই নামাজ পড়েন। নামাজ তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়েই পড়তেন ; সেদিনকার নামাজে কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল। আকাশ, মাঠ এবং সুদূর চক্রবালের বৃক্ষাচ্ছাদিত পল্লীগুলি অস্তগামী সূর্য্যের

বিচিত্র রংএ রঞ্জিত হয়ে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, বাবা সে দৃশ্য দেখে ভেবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেদিনকার নামাজ নূতন এক সার্থকতা লাভ করছিল।

সূর্য্যাস্তের সময় যেমন প্রকৃতির এক বিশেষ মূর্ত্তি দেখতে পাই; রাত্রে, সূর্য্যাস্তের পর, প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি তেমনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সে দৃশ্যের মনোহারিত্ব সূর্য্যাস্তের দৃশ্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। প্রকৃতির এই অপরিমেয় সুষমা উপভোগ করবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছে করেই আমি সন্ধ্যার পর বেড়াতে বের হই। ময়দান কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দূর নীলাকাশে তারাগুলি তিমিরাচ্ছন্ন মানব-জীবনের সুদূর অবস্থিত আশার ক্ষীণ আলোকের মত মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। সম্মুখে কোলাহলপূর্ণ অথচ একান্ত ক্ষণিক একান্ত তুচ্ছ মানব-জীবনের প্রবাহ! সত্যই সে এক উপভোগ্য দৃশ্য।

একবারের অভিজ্ঞতার কথা বলি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। গ্রীষ্মকাল! রাজপথের গ্যাসল্যাম্পগুলি লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল! পোঁ পোঁ, শোঁ শোঁ, শব্দ করে বিবিধ রকমের মোটরযান পথের উপর ছুটোছুটি করছিল। দূরে—ময়দান-প্রান্তে বড় বড় হোটেলগুলি উচ্ছল কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অভাস দিচ্ছিল।

সম্মুখের—শহরের মানব-জীবনের এই ব্যস্ত-সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত। উর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশে নক্ষত্রগুলি অবিরাম গতিতে তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিক্রমণ করছিল। দূরে—অতি দূরে নীহারিকার তরল-শুভ্র প্রবাহ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির, ভবিষ্যৎ বিশ্বের, ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট আভাস দিচ্ছিল।

এই বিরাট, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র এক কোণে, কলকাতার গড়ের মাঠের তুচ্ছ একটী বেঞ্চের উপর বসে আমি চুরুট টানছিলুম, আর এই অবর্ণনীয় দৃশ্য উপভোগ করছিলুম।

ক্ষুদ্র মানব আমি। অতি ক্ষুদ্র আমার দেহ। কলকাতার ক্ষুদ্র এই গড়ের মাঠ পরিক্রমণ করতেই সে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অথচ এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দেহ কত বড় একটা জিনিষকে, আমার মনকে তার মধ্যে স্থান দিয়েছে! কি বিস্ময়কর সে মনের গতি! কত ব্যাপক তার দৃষ্টি! কত গভীর তার অনুভূতি! তুচ্ছ এই পৃথিবী ছেড়ে, ক্ষুদ্র এই সৌর-জগৎ অতিক্রম করে, সুদূর নীহারিকায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কল্পনার দৃষ্টিতে নীহারিকার বাইরের জগৎও সে দেখতে পাচ্ছে! সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরের স্পন্দন সে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করছে!

এই সব অতি বিস্ময়কর, অথচ অতি সাধারণ কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে অপূর্ব্ব এক খেয়াল এল। মনে হল, আমি যেন এই পৃথিবীরও বাইরে, নক্ষত্র-লোকের বাইরে, আর সুদূর নীহারিকারও বাইরে। আমি যেন এ সবের চেয়ে বড় এ সবের চেয়ে বিচিত্র, এ সবের চেয়ে শক্তিমন্ত! অসীম, অভাবনীয় এক শক্তির উৎস [যেন আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আরও মনে হল, বিশ্বের পরম পুরুষ যে শক্তির বলে একা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করছেন, সে শক্তির উৎস] আমার মধ্যেও আছে, আর জড়ের আবর্জ্জনা অতিক্রম করে সে উৎস যদি কখনও পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হয়, তাহলে তার অপূর্ব্ব ধারা সমস্ত বিশ্বকে অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে, আর ইচ্ছামত সেই বিশ্বকে পরিচালিত করবে। অবশ্য এ সব খেয়ালকে খেয়ালের উর্দ্ধে স্থান দিতে আমি বলছি না। তবে কল্পনার এই অবাধ স্ফূর্ত্তিতে, চিন্তার এই বিশ্ব-পরিভ্রমণে, ভাবের এই গভীর স্পন্দনে যে বিমল-বিরল আনন্দ পাওয়া যায়, তা সত্যই উপভোগ্য!

এত গেল অন্ধকার রাতের কথা। চাঁদনী রাতে পৃথিবী যখন সুধাকরের আলোক সুধায় প্লাবিত হয়, দিনের আটপৌরে জগৎ সেই ঐন্দ্রজালিক অপরূপ রূপ ধারণ করে, তখন মনে আর এক ভাব জেগে উঠে। বেড়াতে বেড়াতে তখন কেবল নাচতে ইচ্ছে করে, গাইতে ইচ্ছে করে, অদ্ভুত কিছু

একটা কল্পনার ইচ্ছে করে—মনের আনন্দকে ব্যক্ত করার জন্য, মনের উন্মাদনাকে রূপ দেখার জন্য! তখন মনে আসে কেবল আশার কথা, কেবল আনন্দের কথা, কেবল প্রেমের কথা, কেবল প্রণয়ের কথা। কৌমুদীর সেই ঐন্দ্রজালিক আলোকে নাচতে না জেনেও আমি নেচেছি, গাইতে না জেনেও আমি গেয়েছি, আর কত কি কাণ্ড করেছি! আমায় সে অবস্থায় দেখে ধীর স্থির লোকে হয়ত আমাকে moon-struck (চন্দ্র প্রভাবান্বিত) বলেই মনে করেছে। তা করুকগে। তাতে বড় কিছু আসে যায় না। সেই বিরল আনন্দের জন্য সামান্য একটা অপবাদ সহ্য করা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

ভাবুকের মনে রস সঞ্চারের জন্যই আর্টের সৃষ্টি। বিভিন্ন Emotion মনের মধ্যে জাগিয়ে অনুভূতির বৈচিত্র্যে মনকে সরস করে তোলে বলেই আমরা সাহিত্য পড়ি, অভিনয় দেখি, ছবির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করি। এই রস উপভোগ করবার জন্যই আমরা কোন-না-কোন একটা adventure এর জন্য ব্যাকুল হই, লোমহর্ষণ ঘটনার কথা পরম তৃপ্তির সঙ্গে পড়ি এবং শুনি। বেড়ান হচ্ছে বিভিন্ন রসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার!

খাসিয়া পাহাড়ের বন্য পথ দিয়ে রাত্রে বেড়াতে বেড়াতে আতঙ্কে আমার সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে! বাতাসে গাছ-পালা নড়েছে, আর আমি তাদের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদের অস্তিত্ব কল্পনা করেছি, অদৃশ্য ঘাতকের ছুরির ঝলক দেখেছি, সত্যিকার মস্ত বড় কোন বিপদে পড়লে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয়, কল্পনায় তা অনুভব করেছি। শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভূতের ছায়ামন্ন মূর্ত্তি দেখেছি। নিজেকে রক্ষা করবার জন্য কোরানের শ্লোক আউড়েছি।

আবার মনের ভিন্ন অবস্থায়, পাহাড়ের উপত্যকায় নেপোলিয়ানের মত সৈন্য-চালনা করেছি, ডিমিস্থিনিসের মত বক্তৃতা করেছি, প্রাচীন ভাস্কর এবং স্থপতিদের মত প্রাসাদ এবং নগর নির্ম্মাণ করেছি। একগাছা ছড়ি হাতে করে বেড়াতে বেড়াতে কত কাণ্ডই করেছি, কত রসের আস্বাদই পেয়েছি, কত

মহাঘটনার এবং মহাজীবনের অভিনয়েই অংশ নিয়েছি, কত বিচিত্র Utopiaর কাল্পনিক ছবিই এঁকেছি। দেড় ঘণ্টা পায়ে হেঁটে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করেছি, অতীতের জীবনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছি, বর্ত্তমানের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে একান্তভাবে অনুভব করেছি, ভবিষ্যতের মায়ারাজ্য রচনা করেছি। আমার এই সব কীর্ত্তিকলাপের হিসাব লিখে একটা খাতার পাতার পর পাতা অনায়াসে ভরে দিতে পারি।

সাধারণতঃ আমি লোকালয়ের বাইরে বেড়াতেই ভালবাসি। তবে আমি Diogenese নই, সমাজকে ঘৃণা করি না। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে গল্প-গুজব করতে তো ভালবাসিই, তা ছাড়া অপরিচিতদের জীবনে, দূর থেকে অংশ নিতেও আমি ভালবাসি। এই বেড়াতে বেড়াতে জীবনের অনেক বিশেষত্ব দেখেছি যা বরাবরের মত আমার মনে ছাপ রেখে গেছে।

একবার পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম একটা ছোট ছেলেকে তার বড় ভাই উপদেশ দিতে দিতে চলেছে। কৌতূহল হল, কান দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলুম। গম্ভীর স্বরে বড় ভাই বলছিল,—"হাওড়া ষ্টেশনে তোকে গাড়িতে চড়িয়ে দেবো; তুই লাইনের ষ্টেশনগুলোর দিকে চেয়ে থাকবি। যে ষ্টেশনে 'ডানকুনি' বলে লেখা আছে, সেখানে নাববি। সেই হল আমাদের দেশ। তোকে ঘরে ফিরতে দেখলে বাপ-মা কত খুসী হবেন। তোর বাড়ী পৌঁছুবার খবর পেলে আমি কত খুসী হব। তবে সে সব কি আর হবে! তুই যে বোকা ছেলে, তোর হয়তো ডানকুনির নাম পড়বার কথা মনেই থাকবে না। হাঁ করে তুই মাঠের দিকে চেয়ে থাকবি, আর গাড়ী যে তোকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে বলতে পারে?"

ছোট ভাই—"না দাদা, তুমি ভাবনা করো না, আমি ঠিক ডানকুনি পৌঁছে যাব। কতবার তো তোমার সঙ্গে সেথা গেছি।"

দাদা—"আমার সাথে যখন গেছলি, তখন আমি যে তোর সঙ্গে ছিলুম—"

"আর শুনতে পাওয়া গেল না।" ভ্রাতৃ স্নেহের এমন সুন্দর একটী ছবি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

আমার বড় লোভ হয়, মুসলমানি চায়ের দোকানগুলিতে গিয়ে বসতে। কত বিচিত্র ধরণের লোক সেখানে বসে চা খাচ্ছে, আর গল্প-গুজব করছে! আমার মনে হয়, তাদের সেই গল্প-গুজব থেকেই সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কোন সাহিত্যিক যদি এই সব জায়গায় ঘোরেন, ছোট-খাট একটা আরব্যোপন্যাস লিখতে তাঁকে বেগ পেতে হবে না। Dickens তো এই রকম করেই তাঁর অপূর্ব্ব উপন্যাসগুলির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। আমাদের দেশে যে কেউ সে রকম করবার চেষ্টা করেন না, সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সাধারণতঃ আমি একা বেড়াতেই ভালবাসি। তবে একজন কি দুজন মনের মত বন্ধুর সঙ্গে বেরুলে, তা থেকেও যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকি। বন্ধুর সঙ্গে কোন Interesting বিষয়ের আলোচনা বেড়াতে বেড়াতে যেমন করা যায়, ঘরে বসে তেমন করা যায় না। গতির উত্তেজনা মনকে জাগিয়ে তোলে, পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিকতা নূতন নূতন ভাব Suggest করে, আর সঙ্গীর চিন্তার স্রোতে ভেসে মন অজানা দেশের সফর করতে থাকে। তবে সঙ্গী মনের মত হওয়া চাই, তা না হলে, কখন তার হাত থেকে রেহাই পাব, সেই সমস্যাই আর সবকে ছাড়িয়ে মনকে জুড়ে বসে। বেড়ান তখন, আনন্দ দেওয়া তো দূরে থাকুক, যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে।

তবে দৈনন্দিন বেড়ানর জন্য আমি একটী মাত্র সহচর কামনা করি; সেটী হচ্ছে আমার হাতের যষ্টি! তাকে ছেড়ে আমার পথ হাঁটা অসম্ভব! "অন্ধের যষ্টি" বলে বাঙ্গালায় একটা বচন আছে। যষ্টি না থাকলে অন্ধ নাকি হাঁটতে পারে না। আমি অন্ধ নই, তবু কিন্তু, হাঁটবার জন্য, অন্ধের মত আমরাও যষ্টির দরকার। আর যষ্টিটা হলেই যথেষ্ট!

আমার কবির কথার সঙ্গে কথা মিশিয়ে আমিও বলতে পারি,—"যষ্টি হচ্ছে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যষ্টির সাহায্যে আমি শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করি; যষ্টির সাহায্যেই দরকার মত তাকে সমুচিত শিক্ষা দিই। যষ্টি আমার পথের সঙ্গী, যষ্টিই আমার বিপদের সহায়। যষ্টির উপর ভর করে আমি ভ্রমণে বের হই, আর যষ্টির উপর ভর করেই আমি ঘরে ফিরি। কৃতঘ্ন মানুষের মত আমার এই যষ্টি, কিছু না দিয়ে সব চায় না; পরন্তু, সে সব দেয়, অথচ কিছুই চায় না। সারা পথটা বীর পার্শ্বচরের মত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে; অথচ যখন ঘরে ফিরে আসি, বিপদের কোন আশা যখন আর থাকে না, তখন কাছে এসে সে আমায় বিরক্ত করে না; এক কোণে মাথা ঠেস দিয়ে পড়ে থাকতে পারলেই সে সন্তুষ্ট। প্রকৃত অন্তরঙ্গের মত কিন্তু আমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই সে সজাগ, সর্ব্বদাই সে সচেষ্ট! যখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখনই সে প্রস্তুত।" বেড়াবার জন্য এমন বিশ্বস্ত, অথচ এমন নিঃস্বার্থ সহচর আর কেউ নাই।